বিশেষ

দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

# নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ১১সংখ্যা ❖১৭ অক্টোবর ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে


প্রবন্ধ

- সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ — সুকুমারী ভট্টাচার্য — ৩
- শরৎবাবুর নায়িকারা — তপস্যা ঘোষ — ৫
- মৃণাল সেন : আজন্ম বিপ্লব পিয়াসী এক চলচ্চিত্রকার — তানভীর মোকাম্মেল — ১০
- থার্ড থিয়েটারের রাজনীতি ও বাদল সরকার একটি বিতর্ক — মলয় রক্ষিত — ১৪

বিজ্ঞান

- ইয়েল্লাপ্রগড়া সুব্বারাও — মানস কুমার লাহা — ১৮

ইতিহাস

- কাশ্মীরের পন্ডিত সমাজের নিষ্ক্রমণ সম্পর্কে কিছু কথা — শুভ বসু — ২২

পরিবেশ

- হিমালয়ের বিপর্যয় মানুষের স্বকৃত নিয়তি — রাহুল রায় — ২৭

ভ্রমণ

- শেষ শরতের চিঠি মার্কিন মুলুক থেকে — সিদ্ধার্থ সেন — ৩২

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

- গাজা পূর্ণ দখলদারির লক্ষ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি — মনিরুল হক — ৩৬

অর্থনীতি

- জিএসটির হার কমলেই দাম কমানোর বাধকতা নেই বিক্রেতার — অমিত দাসগুপ্ত — ৩৮

গল্প

- হেল্পলাইন — সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার — ৪১
- প্রতিদিন মনে পড়বে — মশিউল আলম — ৪৭

কবিতা

- অনুপ্রবেশ ! — জয়ন্ত কুমার সাহা — ৫১
- বিপন্ন সেই মেয়ে — মৈথিলী — ৫১
- প্রকাশিত হব — মিলি দাস — ৫১

# সম্পাদকীয়

## নরেন্দ্র মোদির সরকারের দেশের স্বাধীন বৈদেশিক নীতি বিসর্জন

নাগরিক - এর সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে পত্রিকার পাঠক , শুভানুধ্যায়ী , লেখক সকলকে শারদ শুভেছা জানাই। এই উৎসবের প্রাক্কালে ও পরে অতিবর্ষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে মূলত কলকাতা শহর, মিরিক ও ডুয়ার্স-এ কিছু মানুষের জীবনহানি হয়েছে । কিছু অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা মৃতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আশা করি দেশের সরকার ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলি দলীয় সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। এই সঙ্গে অতিবর্ষণ হলেই বন্যা ও তার সঙ্গে হিমালয়ে ভয়ঙ্কর ধ্বস ও ভূমিক্ষয়ের কারণগুলির বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান প্রয়োজন। উৎসবের আবহের মধ্যেই আবার একটি ধর্ষণকাণ্ড ঘটল দুর্গাপুরে। এই ঘটনা কঠোর ভাবে নিন্দনীয়। দুর্গাপুরের মতন শহরে যখন ডাক্তারি পাঠরতা তরুণী রাত নটার সময় ধর্ষিতা হন, তখন বুঝতে হবে ওই এলাকা নিরাপত্তাহীন ও এই দুষ্কৃতীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বেপরোয়া। আর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার দায় চাপিয়েছেন ওই তরুণীর ওপর। বলেছেন রাত বারোটায় ওই তরুণী কেন ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়েছিলেন। ওঁর এই বক্তব্য সঠিক নয় এবং অসংবেদনশীল। অন্যদিকে একটি দুঃখজনক ঘটনাকে সামনে রেখে কি ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো যায় সেই উদাহরণ স্থাপন করে চলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। ওই ছাত্রীটির প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই। তিনি ধর্ষকের ধর্ম খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এই ধরনের নিম্নমানের রাজনীতি অতীব নিন্দনীয় ।

এই সম্পাদকীয় লেখার সময় গাজায় সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তিচুক্তির ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে।যদিও ট্রাম্প সর্বদা গাজার ওপর ইজরায়েলের ভয়াবহ বর্বর আক্রমণকে সমর্থন করে গিয়েছেন।উগ্র ' Zeonism বা জায়নবাদ 'নেতানিয়াহুর মতাদর্শ ।এই ফ্যাশিস্ট শক্তি নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে অন্তত ৭০ হাজার শিশু , নারী , বৃদ্ধকে হত্যা করেছে । দেশে বিদেশে ধিকৃত , নিন্দিত এই নেতানিয়াহু। প্যালেস্টাইন এই আক্রমণের কাছে মাথা নত করেনি ।শান্তি ও মানবতার দূত গ্রেটা থুনবার্গের আহ্বানে গোটা ইউরোপ সারা দিয়েছে। ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ৪০ টি জাহাজ যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে গাজার দিকে আসছিল তখন ইজরায়েলি নৌবহর তাদের অন্যায় ভাবে বাধা দেয়।

এই যে শান্তি চুক্তি হচ্ছে তা কতদিন স্থায়ী থাকে এখন সেটাই দেখার।১৯৯৬ এর অসলো চুক্তির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে । রাষ্ট্রপুঞ্জে ইজরায়েল ধিকৃত নিন্দিত। জুন মাসে তাদের বিরুদ্ধে আনীত নিন্দা প্রস্তাবটি ১৪৯ টি দেশ সমর্থন করেছে । যে গুটি কয়েক দেশ (১৯) এই নিন্দা প্রস্তাব সমর্থন করেনি তার মধ্যে ভারত অন্যতম। আর আমেরিকার সঙ্গে মাত্র ১২ টি দেশ ইজরায়েলকে সমর্থন করে। শুধু তাই নয় গাজাতে ট্রাম্পের তথাকথিত শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে যখন অধিকাংশ দেশ পর্যবেক্ষণ করছে তখন মোদি ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্রাম্পের প্রশস্তি করে ভারতের দীর্ঘ ৭০ বছরের বৈদেশিক নীতিকে লঙ্ঘন করেছেন। শুধু তাই নয় মোদি নেতানেয়াহুর মতন গণ হত্যাকারীকে তার বীরত্বের জন্য প্রশংসা করেছেন। গাজা ভূ খন্ডের সমস্যা দ্বিপাক্ষিক । তা প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েলের মধ্যে আলোচনার বিষয়। এটাই ছিলো ভারতের গত ৬৫ বছরের অবস্থান।এখানে মার্কিন খবরদারিকে সমর্থন করার অর্থ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে মার্কিন হস্তক্ষেপকে আমন্ত্রণ করা।মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অন্তত ২৫ বার বলেছেন তিনিই অপারেশন সিঁদুর শুরু হবার চতুর্থ দিনের মাথায় বন্ধ করিয়েছেন। মোদি আজ পর্যন্ত ট্রাম্পের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে ২০১৪ সাল থেকে ভারতের জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন বৈদেশিক নীতির কোনও অস্তিত্ব নেই । এখন তা মার্কিন দেশের পররাষ্ট্রনীতির অনুসারী । শাহবাজ খানের সঙ্গে কে কতটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড় ভক্ত হতে পারে তাই নিয়ে নরেন্দ্র মোদির প্রতিযোগিতা।

ইতিমধ্যে আফগানিস্তানের চরম মৌলবাদী তালিবান সরকার , যারা সমস্ত রকমের মানবিক মূল্যবোধের বিরোধী , নারী বিদ্বেষী ও অত্যাচারী তাদের বিদেশ মন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদির সরকার আমন্ত্রণ করে দিল্লিতে নিয়ে এসেছেন। এই বিদেশ মন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও মহিলা সাংবাদিকের প্রবেশাধিকার ছিলনা। আমাদের বিদেশ দপ্তর চাপের মুখে বললেন তারা কিছু জানতেন না। আশ্চর্য ! পরে অবশ্য তারা আবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে মহিলা সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করেন।

দেশের অভ্যন্তরে যে দলের প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর অনুগামীরা প্রতি নিয়ত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করেন তাঁরা এখন দেশের বাইরের চরম ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে চাইছেন কেন ?

সম্পাদক

**শান্তনু দত্ত চৌধুরী**

সম্পাদকমন্ডলী

**সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।**

**সৌর বসু** কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ● ফোন : 80178 04019 / 94340 22512 ● ওয়েবসাইট : nagorik.co.in

পুরনো লেখা ফিরে পড়া

# সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

সুকুমারী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ির পাশেই ছিল মুসলমান পাড়া। জমিদারি শিলাইদহের কাছেও মুসলমান বসতি ছিল; মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রতিবেশী হিসেবে খুব কাছ থেকেই তিনি দেখেছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে জেনেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মিশে, পড়ে ও আলাপ আলোচনায়। আর নিজস্ব চর্চা অধ্যয়ন এবং ক্ষিতিমোহন সেনের সাহচর্যে বাংলার তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যে হিন্দু মুসলমানের যৌথ প্রয়াসের সৃষ্টি, তাও ভাল করেই বুঝেছিলেন। বিংশ শতকের শুরুর দিকে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব কয়েক বৎসরে যে মোহ জন্মেছিল, তাও কেটে গেল। ১৯০৮ সালে 'রাজাপ্রজা' প্রবন্ধে লিখলেন, "বর্তমানকালে হিদুয়ানির পুনরুত্থানেরযে একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ঐ অনৈক্যের ধুলা সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিইউড়িয়াআসিয়াআমাদেরআচ্ছন্ন করিয়াছে। দ ঐ বছরেই 'সমূহ' প্রবন্ধে লেখেন, 'বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাতে আমরা ভীত হইব না-আমাদের নিজেদের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয় পারিব। ''সাম্প্রদায়িক রোগ নির্ণয়ের দৃষ্টি তাঁকে জানিয়েছিল যে, বাইরের প্ররোচনা কখনোই মারাত্মক আকারে দেখা দিতে পারে না, যদি দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মন পরস্পর সম্বন্ধে নির্মল ও সৌভ্রাত্র্যপূর্ণ থাকে।

ঐ ১৯০৮ সালেই 'রাজাপ্রজা' প্রবন্ধের এক জায়গায় বলছেন,''হিন্দুমুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা, কোনো সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বলা হইতেছিল, তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাইযে সুবিধার কথাটা এস্থলে মুখে আনিবার নহে; দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম ভাল চলে, কিন্তু সেইটাই দুই ভাই এক হইয়া থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে।... আসল কথা, আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রেবাস করি, আমরা

> হিন্দু বা মুসলমান যদি কেউ ভগবানকে মানে ও বিশ্বপিতা বলে বিশ্বাস করে তবে অনিবার্যভাবে ভগবানের সন্তান হিসেবে দু'সম্প্রদায়ের এবং ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর তাবৎ সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে ভাই বলে স্বীকার না করাটা মিথ্যাচারণ।

মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম।... শুধু সুবিধা নহে, অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত যদি না হই তবেআমাদের মনুষ্যত্বে ধিক্। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।'' মূলত প্রতিবেশী হিসেবে, ভাই হিসেবে, স্বদেশবাসী হিসেবে হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক যে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক এ নিয়ে দেশের সকল যথার্থ মহাপুরুষের মত রবীন্দ্রনাথেরও বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। হিন্দু বা মুসলমান যদি কেউ ভগবানকে মানে ও বিশ্বপিতা বলে বিশ্বাস করে তবে '' অনিবার্যভাবে ভগবানের সন্তান হিসেবে দু'সম্প্রদায়ের এবং ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর তাবৎ সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে ভাই বলে স্বীকার না করাটা মিথ্যাচারণ। আর এর ঊর্ধ্বে যাঁরা উঠতে পেরেছেন, যাঁদের জীবনদর্শনের ছক ঈশ্বর নিরপেক্ষ, তাঁরা ত অনায়াসেই স্বীকার করেন যে সব মানুষই পরস্পরের ভাই।''

১৯২২ সালে 'কালান্তর' প্রবন্ধে লিখলেন, 'এক সময়ে গ্রীক পারসিক নানা জাতিরঅবাধ সমাগম ও সম্মেলন ছিল... সে 'হিন্দু'যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ- এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান্ জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়।....এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ ও প্রত্যাখ্যান। ''আজ 'সঙ্ঘ পরিবারে'র অভ্যুত্থান ও প্রকোপের কালে একথা দ্বিগুণ ভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। মুসলমান ভারতবর্ষের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, একথা বলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ নিজেকে এমনভাবে সংকুচিত করে তুলেছে আজ, যে তা

অমানবিক বলেই অশুচি ও ঘৃণ্য। প্রায় সত্তর বছর আগে কবির দৃষ্টি এই ঠেকিয়ে রাখার নীতি সম্বন্ধে ধিক্কারে সরব ছিলেন।

ঐ'কালান্তর' প্রবন্ধেই বলেছেন, ''যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতেপারে, কিন্তু ছাদ রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়'' এখানে কবিযে কথাটা বলতে চেয়েছেন তা আজ আরও অনেক বেশি গুরুতরভাবে উপস্থিত হয়েছে, দেশের স্বার্থরক্ষার কাছে সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা গৌণ এবং যৌথভাবে সব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাই যথার্থভাবে দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যরক্ষার ও উন্নতির উপায়। কোনো সম্প্রদায়কে সংখ্যা গুরুত্বের জোরে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা বা 'কর্মভূমি' 'পুণ্যভূমি' ইত্যাকার ছেঁদো ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রণোদিত নীচ কথার উল্লেখ আজ সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়, ঘৃণাভরে উপেক্ষণীয়।

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে কবি মর্মান্তিক সত্যের উচ্চারণ করেন গভীর বেদনা ভরে;

'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধিরআলো
শাস্ত্র মানে না মানে মানুষের ভালো।
বিধর্ম বলি মারে পর ধর্মেরে
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহি কো জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্ত মাখানো ধ্বজা
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।
হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্ম মূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।'

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে অনেক বেশি তাৎপর্য পেয়েছে এ কবিতা, এর প্রতিটি ছত্র উচ্চারণ করে আত্মবিচার করবার সময় এসেছে 'আমি কি যথার্থই ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে আপনজন জ্ঞান করতে পারছি?' না পারলে আমিই প্রকৃত ভারতবাসী নই।

'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের ১৫ নং কবিতায় কবি নিজের ধর্মবিশ্বাসের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন, একটি অবিনশ্বর সত্যের ঔজ্জ্বল্যে অমর এই কবিতাটি। দু'চারটি ছত্রে তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসী ভগবদ্বিশ্বাসীদের থেকে নিজের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতনতার আভাস আছে।

যারা সব মানুষকে অন্তর থেকে
আপন জেনে, মেনে
সেইমত সৌভ্রাত্র্যপূর্ণ
আচরণ করতে প্রস্তুত নয়,
কবি তাদের পামর,
মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড বলে
ধিক্কার দিয়েছেন, শিখিয়েছেন
পরস্পরের কাছে
মানুষের একমাত্র পরিচয়
সে মানুষ।

'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায় আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।'

'আজ আপন মনে ভাবি, কে আমার দেবতা
কার করেছি পূজা।
...মন্দিরেররুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলেগেল দিগন্তের দিকে
সকলবেড়ারবাইরে।'
'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরেরবাইরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোকথেকে মানবলোকে।'

দেশের শ্রেষ্ঠ কবি মনীষীর এই অন্তিম উচ্চারণ এই দুর্দিনে আমাদের প্রেরণা দিক। যেন দেখতে পাই সব ধর্মধ্বজীরাই শেষ পর্যন্ত সিংহাসন-লোভী, স্বার্থান্বেষী, বর্বর ও নির্মম। ধর্মের আড়ালে তাদের লোভের ও রাষ্ট্র ক্ষমতালাভের উচ্চাশার বেসাতি। যারা সব মানুষকে অন্তর থেকে আপন জেনে, মেনে সেইমত সৌভ্রাত্র্যপূর্ণ আচরণ করতে প্রস্তুত নয়, কবি তাদের পামর, মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড বলে ধিক্কার দিয়েছেন, শিখিয়েছেন পরস্পরের কাছে মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ। সেই সুবাদেই সে নির্বিচারে ভাই, সব অধিকারে সম্পূর্ণ সমকক্ষ। এর বিরুদ্ধে যাদের প্রচার ও আচরণ তারা আজ মানবজাতির একান্তশত্রু। তারা মানববিদ্বেষী, মানব-বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপে রাক্ষসের মত মানুষের রক্তপানে লোলুপ। তাদের স্বরূপে চিনে নিয়ে সর্বতোভাবে রুখতে আমাদের প্রেরণা দিক কবির উপলব্ধি ও উচ্চারণ। ❐

(১৯৯৭ সালে প্রকাশিত সুকুমারী ভট্টচার্যের 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে)।

প্রবন্ধ

# শরৎবাবুর নায়িকারা

তপস্যা ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ 'সাধারণ মেয়ে'র আখ্যান লিখতে বলেছিলেন শরৎবাবুকে। দুঃখী সাধারণ মেয়ে, নিতান্ততুচ্ছ মেয়ে, যদি কোন অসাধারণত্ব থাকেও, তার অন্বেষণ করার জন্য, কেউ হয়ত থাকে না। 'কাঁচা বয়সের যাদু'তে তারা বিকিয়ে যায় 'মরীচিকার দামে'। এখানেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কলম থেমে যায়নি, তিনি চেয়েছিলেন এই সাধারণ মেয়েটি অসাধারণ হয়ে উঠুক কলমের এক আঁচড়ে। বড়ো বড়ো নামজাদার সভার মাঝখানে যেন সে অনায়াসে আপন অহঙ্কারে হয়ে থাকতে পারে উন্নতশির, এগিয়ে যেতে পারে চারিদিকের হাততালিকে উপেক্ষা করে; এই স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন শরৎবাবুই। করেছেনও বটে। পঁচিশ বছর একটানা গল্পই লিখে গেছেন শরৎচন্দ্র। ১৯১৩ থেকে ১৯৩৮; তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সাধারণ মেয়ের আখ্যান, আটপৌরে রোমান্টিক ঠাসবুনোট গপ্পো, নিপাট সহজ ভাববিভোর ভাষা; এই হল তাঁর পুঁজি। অবিরত লিখে গেছেন প্রেমাকুল মেয়েদের গল্প। পতিতা, বিধবা, বৈষ্ণবী, সতী, অরক্ষণীয়া অথবা বিয়ে-বহির্ভূত প্রেম; তা সে যেমনটাই হোক না কেন, শরৎবাবু অভিভূত হয়ে থাকতেন তাঁদের প্রেমে।

শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'জীবনে যে ভালবাসলে না না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখের ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে? খসবচেয়ে জ্যান্ত সত্যিকার সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখেননি বাংলাদেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়।' শ্রীকান্ত প্রথম পর্বেও এই একই অভিমান শ্রীকান্তের। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের একটানা ছিছি বর্ষণে তাঁর মন হতাশ হয়ে পড়েছিল, জন্মেছিল আত্মধিক্কার। জীবনের শুরুতে যে ছিছিক্কার তাড়না করেছিল শ্রীকান্তকে, জীবনের উপান্তে পৌঁছে সেই ধিক্কারকে মেনে নিতে মন সায় দেয়নি তার। তার 'ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ণে' পৌঁছে বিগত স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে শ্রীকান্ত বিচিত্র সৃষ্টিকে উপভোগ করেছিল, অন্বেষণ করেছিল নিজের কাজের যৌক্তিকতা। এই বৃত্তান্তে মগ্ন হতে হতে বারবার শরৎচন্দ্রের জীবনযাপনই মনে আসে। মানুষের অন্তরের অনন্ত রহস্যে ডুব দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, উপন্যাসের শ্রীকান্ত। তাই শ্রীকান্ত বলে, জগতের অনেক বাস্তব কল্পনাকে অরিক্রম করে কোথায় যে চলে যায়, তা বলে বোঝানো দায়।

শরৎচন্দ্রের জিত সেখানেই, তিনি সত্য কথা সোজা করে বলতে গিয়ে কবিত্ব করতে পারেন; বাস্তব এবং কল্পনা একাকার হয়ে যায়। এই উপন্যাসে তাই স্পষ্টতই দুটি স্তর, আত্মকাহিনী এবং আত্মসমালোচনা।

রেঙ্গুন-ভ্রমণের প্রায় শেষে লিখলেন এই শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব। পেলাম আমরা ইন্দ্রনাথকে, রাজলক্ষ্মীকে। রাজলক্ষ্মীর পিয়ারীবেশ হয়ত কল্পনা, কিন্তু রাজলক্ষ্মী শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ বাল্যসঙ্গিনী, দেবানন্দপুরে যে কিশোরীটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল শরৎচন্দ্রের, তাঁর 'উৎপাত ও উপদ্রবেরও পরম সহিষ্ণু পাত্রী ছিল।' অবশ্য লেখক একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাবে? ওসব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা বানানো উপন্যাস বইত নয়; ওসব মিছে জনরবে কান দিতে নেই। কাহিনীটি তি সত্য?' শ্রীকান্তের পড়াশোনার বিবরণ বিন্তু শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। অথবা ইন্দ্রনাথ? ভাগলপুরের বন্ধু রাজু তথা রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের অবিরল গপ্পো। সন্ন্যাসী শ্রীকান্ত যেভাবে জীবনকে প্রত্যক্ষ করে, তারও সঙ্গে প্রত্যক্ষ, সাদৃশ্য আছে সন্ন্যাসীবেশী ভ্রামণিক লেখকের। শ্রীকান্ত ভ্রমণ করেছিল, শরৎচন্দ্র সেই ভ্রমণকে প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীকান্ত দাবি করেছে, সে নাকি যা দেখে, অবিকল দেখে, কবিত্ব সৃষ্টিতে সে অপারগ। শরৎচন্দ্রের জিত সেখানেই, তিনি সত্য কথা সোজা করে বলতে গিয়ে কবিত্ব করতে পারেন; বাস্তব এবং কল্পনা একাকার হয়ে যায়। এই উপন্যাসে তাই স্পষ্টতই দুটি স্তর, আত্মকাহিনী এবং আত্মসমালোচনা।

বস্তুত এটা বোধহয় তাঁর আরও অনেক লেখাতেই প্রকট। 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র'-এ মোহিতলালের বিশ্লেষণ, 'ইহার নায়ক একাধারে আত্মও বটে, পরও বটে। লেখক যেন আপানাকেই বাহিরে একটু তফাতে ধরিয়া দেখিতেছেন।' 'চন্দ্রনাথ' পড়েও কেন মনে হয়, এ তো শরৎচন্দ্রের শান্তিদেবীকে বিয়ে করার কাহিনী। রেঙ্গুনে থাকাকালীন লেখক যে বাড়িতে থাকতেন, তার নীচের তলায়

থাকতেন এক বাঙালি ব্রাহ্মণ, পেশায় সে মিস্ত্রি। মাতাল চক্রবর্তীর সংসারে ছিল একমাত্র কন্যা শান্তি; যাকে মাতাল বাবার অনেক অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে হত। এরকমই একদিন শন্তি শরণাপন্ন হয়েছিলেন লেখকের। চক্রবর্তীকে অনেক বুঝিয়েও যখন কাজ হল না, তখন শরৎচন্দ্র নিজেই শান্তিকে বিয়ে করেন এবং সুখেই চলেছিল দিনযাপন। চন্দ্রনাথ উপন্যাসে চন্দ্রনাথ-সরযূবালার বিয়েও অনেকটা এমনভাবেই ঘটেছিল।

প্লেগাক্রান্ত শান্তিদেবীর মৃত্যু হলে শরৎচন্দ্র বিয়ে করেন হিরন্ময়ী দেবীকে। বিতর্ক ঘনিয়েছিল এই বিয়ে নিয়েও। বিয়ে কোথায় কীভাবে হয়েছিল, তা নির্দিষ্ট করে বলাও মুসকিল। তবে রাধারানী দেবীর লেখা থেকে জানা যায়, এই বিয়ের কোন অনুষ্ঠান হয়নি। এই সম্পর্কটিকে আইন মতে বৈধতাও দেওয়া হয়নি। তবে শরৎচন্দ্র তাঁকে চিরকাল স্ত্রীর সম্মান দিয়েছেন এবং তাঁর উইলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন তিনি হিরন্ময়ীকেই। স্বামী অনুরাগিনী এই স্ত্রীর সাহচর্যে থাকার ফলে উচ্ছৃঙ্খল লেখক তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসেও তাঁর কমল মানতে চায়নি বিয়ের বন্ধনকে। এ বন্ধন তার কাছে প্রেমের সমার্থত নয়। শিবনাথের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনকে সে স্বীকার করে নিতে চায়নি, আবার বিয়ের অজিতের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে সে নিজেকে আবদ্ধ করেনি। তাঁর মতে আসল বন্ধন থাকে মনে। এমনকি কমলের অভিমত, 'চাটুবাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারীজাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল। এমন কোন আচার-অনুষ্ঠানে কমলের ভাবি অবজ্ঞা, যে আচার বিচারবুদ্ধির ওপর একটা পর্দা ঝুলিয়ে দেয়। হয়ত এ-সব ভাবনারই উৎস তাঁর নিজের জীবনযাপন। শিবনাথ তার দ্বিতীয় বিয়েটি করেছিল শৈব মতে। এতে ক্ষুদ্ধ অবিনাশের মন্তব্য, 'অর্থাৎ, ফাঁকির রাস্তাটুকু যেন দশদিক দিয়েই খোলা থাকে, না শিবনাথ'? বিচলিত হয়না শিবনাথ, পাল্টা তার জবাব, 'এটা ক্রোধের কথা অবিনাশবাবু। নইলে বাবা দাঁড়িয়ে থেকে যে বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে তো ফাঁকি ছিল না, অথচ ফাঁক যথেষ্টই ছিল।

এই বিয়েগুলোর আগে শরৎচন্দ্র একবার উন্মত্ত হয়েছিলেন একটি মেয়েকে নিয়ে, তার নাম গায়ত্রী দেবী। প্রতিবেশী যুবকের প্ররোচনায় গায়ত্রী গৃহত্যাগ করেছিল এবং বহু আপমানও তাকে সহ্য করতে হয়েছিল এ সময়। শরৎচন্দ্র গায়ত্রীর দুঃখে কাতর হয়ে বলেছিলেন, সমাজের চোখে গায়ত্রী পতিতা; অতএব আত্মীয়-স্বজনের ঘরে ঠাঁই পাবে না সে। অথচ এই মেয়েটির চোখের জলের হিসেব কোনদিন নেবে না সমাজ। এই সমবেদনাই রূপান্তরিত হয়েছিল প্রেমে। তবে গায়ত্রী শরৎচন্দ্রের প্রস্তাবে সায় দেন দেয়নি। এ এধরনের ঘটনাও তাঁর উপন্যাস রচনায় পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছিন।

রেঙ্গুনে ও পেগুতে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন, সেই অভিজ্ঞতাও বোধহয় তাঁকে উপন্যাসের কাহিনী রচনায় প্রণোদিত করেছিল। মদ্যাসক্তি এবং বেশ্যাসক্তি ছিল তাঁর। তিনি সে এজন্য আত্মীয়পরিজনের কাছে ধিক্কৃত এবং নিন্দিত হতেন, তাও জানা ছিল তাঁর। সপ্তাহের কোন কোন দিন তিনি অফিসেও যেতেন না। এ রকম বর্ণনাও পাওয়া যায় 'মাসের মাহিনা হাতে পেলেই বন্ধুদের সঙ্গে পাড়ি দিতেন একটু আনন্দলাভের আশায়। নির্দিষ্ট স্থানের কোন স্থিরতা ছিল না; যখন যেখানে খুশী, দল বেঁধে যেতেন, হৈ-চৈ করে রাত কাটিয়ে আসতেন বাসায়।' শরৎচন্দ্রের নামের সঙ্গে ছড়িয়েছিল অনেক পরিরার নামই, তবে তার সত্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত নন। এরকম কাহিনী লিখিত হয়েছে, বাসন্তী নামে এক পতিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এতটাই বেশি ছিল যে, এই মেয়েটির প্লেগ হলে শরৎচন্দ্র তার সেবা করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর শেষকৃত্যও করেছিলেন।

বাসন্তীদেবী ও গায়ত্রীর সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠতার গল্প 'চরিত্রহীন'-এর সতীশ-সাবিত্রীর প্রসঙ্গ স্মরণ করায়। শরৎচন্দ্র যে-ভালবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন, সেই ভালোবাসায় মগ্ন হয়েছিল সতীশ-সাবিত্রী। প্রসঙ্গ ভিন্ন প্রেক্ষাপটও আলাদা, কিন্তু ভালোবাসার গল্পটা এক। এই বাসন্তীর গল্পটির আঁচে কি তৈরি হয়েছে দেবদাস-এর চন্দ্রমুখী-দেবদাস কাহিনী? অথচ শরৎচন্দ্র দেবদাস রচনার জন্য লজ্জিত হয়েছেন, একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, বেশ্যাচরিত্র তো আছেই তাছাড়া আরও কি কি আছে বলে মনে হয়।' সে জন্য প্রত্যাখ্যান করছেন, সেই জীবনযাপনেই তো অভ্যস্ত ছিলেন শরৎচন্দ্র।

অথচ শরৎচন্দ্র যখন 'নারীর মূল্য' লেখেন তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভে, তখন নারীর যে মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গতি নেই তাঁর কালযাপনের। এই লেখাগুনি যমুনা পত্রিকায় যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন সেখানে ছিল ছদ্মনাম; অণিমা দেবী। এটি লেখকের দিদির নাম। কেন? কোন সংকোচে এমন ছদ্মনামের ব্যবহার? নাকি নারীর পক্ষে সওয়াল করার জন্য তিনি আড়াল খুঁজেছিলেন একজন নারীর অথবা নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনই এর অন্তর্নিহিত কারণ?

শরৎচন্দ্রের মনে হয়েছিল নারী সুলভ বলে তার যথার্থ মূল্য নির্ধারণ আদৌ সম্ভব নয়।

যেদিন নারী হয়ে যাবে দুর্লভ, সেদিনই সমাজ অনুধাবন করতে পারবে নারীর যথার্থ মূল্য। সমাজ নারীর মূল্য নির্ধারণ করে তার সেবাপরায়ণতায়, স্নেহশীলতায়, সতীত্বে এবং সহনশীলতায়। নারী কতটা সুবিধে দিতে পারে; সেই মানদণ্ডেই যাচাই হয় নারীর মূল্য। অথবা 'তিনি কতটা রূপসী; অর্থাৎ পুরুষের লালসা এবং প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন।' নারীর মূল্য উপলব্ধির এই একমাত্র পথ। লেখকের স্পষ্ট দৃঢ় সিদ্ধান্ত, 'যে ধর্ম বনিয়াদ গড়িয়াছে আদিম জননী ইভ-এর পাপের উপর, যে ধর্ম সংসারের সমস্ত অধঃপতনের মূলে নারীকে বসাইয়া দিয়াছে, সে ধর্ম সত্য বলিয়া যে- কেহ অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার সাধ্য নয় নারীজাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দ্যাখে। লেখক মনে করেন না যে পুত্র প্রসবার্থেই নারীর সার্থকতা। নারীর অবমাননার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র পিতা-ভ্রাতা-স্বামী; সব পুরুষেরই হীনতার দিকটি লক্ষ্য করেছেন। পুরুষ যে তার নিয়মে সমাজকে গ্রাস করে, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চালায়, তার বিরুদ্ধেও লেখকের জেহাদ। এই পিতা-ভ্রাতা-স্বামী সকলেরই তখন একটাই পরিচয়, কী? না তারা পুরুষ। আর নারীও তাদের আত্মীয় নয়, তারা শুধুই নারী। যাবতীয় ধর্ম, যাবতীয় শাস্ত্র এ বিষয়ে একই সুরে গলা মেলায়। লেখক প্রসঙ্গত বিধবাবিবাহ নিয়ে ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিরূপতা। বিধবা মাত্রই কি কুলত্যাগিনী? অথবা বিধবারা কি কুলত্যাগিনী হওয়ার জন্য আকুল? তাঁর কথা, 'বিধবাদের জোর করিয়া ব্রহ্মচর্যের গণ্ডীতে রাখা আমার অসহ্য মনে হয়। জোর করিয়া বিধবাদের বিবাহ দেওয়া যেমন অন্যায়, জোর করিয়া তাহাদের বিবাহ না দেওয়াও তেমনি অন্যায়।' এর পরের বাক্যটিতে আছে, গায়ত্রীকে কেউ ধর্মমতে বিয়ে করতে চাইলে তাতে কোন দোষ থাকতে পারে না। অথচ ঠিক আগের বাক্যটিতে নিজের বিয়ের ব্যাপারে বিধবার সম্মতি অসম্মতিকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র। তাহলে গায়ত্রীর বিয়ের ব্যাপারে কি তার মতই একমাত্রবিবেচ্য নয়? তখন কি আসলে শরৎচন্দ্র আচ্ছন্ন হয়েছেন নিজের ভালেবাসার মোহে?

এই মোহেই বিভ্রান্ত তিনি অনেক সময়। পতিতার আখ্যান যখন বিবৃত হয়

যেদিন নারী হয়ে যাবে দুর্লভ, সেদিনই সমাজ অনুধাবন করতে পারবে নারীর যথার্থ মূল্য। সমাজ নারীর মূল্য নির্ধারণ করে তার সেবাপরায়ণতায়, স্নেহশীলতায়, সতীত্বে এবং সহনশীলতায়। নারী কতটা সুবিধে দিতে পারে; সেই মানদণ্ডেই যাচাই হয় নারীর মূল্য।

শরৎসাহিত্যে, তখন তার গ্লানি-ক্লেদ-তিক্ত-অসম্মানিত জীবনের কোন রূঢ়তার বর্ণনায় লেখক আগ্রহী নন। ওই পঙ্কিলতার কোন ছবি আঁকতে আগ্রহী নন শরৎচন্দ্র। সবার ওপরে সত্য তাঁর প্রেম; প্রেমের একনিষ্ঠতা; প্রেমের রোমান্টিকতা। পতিতাটি তখন একমনে ভালবাসে তার দয়িতকে; সেই ভালোবাসায় সে মহান হয়ে যায়। পিয়ারী বাইজি বাল্য প্রণয়ের টানে আজীবন শ্রীকান্তনিষ্ঠ হয়ে থাকে, সাবিত্রী-সতীশের মধ্যে চলে প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা, চন্দ্রমুখী অনুরক্ত হয়ে রইল দেবদাসের প্রতি, বিজলী সত্যেন্দ্রের প্রেমে বাইজি পেশা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্যি উঠলে রাত্রি মরে; আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজি চিরদিনের জন্য মরে গেল।' কিন্তু বাস্তব এত সাদাসিধে নয়। এই পতিতারা ব্যক্তিবিশেষের আস্থাভাজন হয়, কিন্তু সামাজিক সম্মান অর্জন করে না; সমাজের সঙ্গে তাদের কোন টানাপোড়েন তৈরি হয় না আদৌ। তাদের স্বাতন্ত্র্য-ব্যক্তিত্ব-অস্তিত্বের লড়াই বিলীন হয়ে যায় কোন এক পুরুষের মধ্যে। প্রেমের সামাজিক স্বীকৃতি হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁদের একটাই কথা, 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না; ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না; এই সুখৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত।'

বৈধব্যজীবনের রূঢ়তার বর্ণনার ক্ষেত্রেও এই একই অনাগ্রহ লেখকের। সমাজের যে দায় বহন করতে হয় বিধবাকে, শরৎচন্দ্র সে বিষয়ে মনোযোগী নন।তাঁর সমস্ত অভিনিবেশ বিধবার প্রেমে। প্রেমই তার উত্তরণের একমাত্র পথ। অবশ্য 'পল্লীসমাজ'-এ নিছক প্রেম আচ্ছন্ন করেনি রমাকে; প্রেমের বাইরেও রয়েছে তার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। পল্লীসমাজ দেওয়াল হয়ে ব্যবধান তৈরি করেছে রমা-রমেশের। পরিণতিতে রমাকে কাশীবাসী হতে হয়েছে। কিন্তু 'বড়দিদি'র মাধবী, 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী বা 'পথনির্দেশ'-এর হেমনলিনীর জীবনে শুধু সত্য হয়ে থাকে প্রেম। কিরণময়ীর মতো বুদ্ধিমতী, আত্মনির্ভরশীল নারীর জীবনে যে ভয়ানক বিপর্যয় দেখানো হয়েছে, তা তো আসলে সামাজিক শাস্তি। কিরণময়ীর উন্মত্ততা অনেকটা যেন 'চোখের বালি'৩৯;র বিনোদিনীর আদলে ভাবা হয়েছে। বৈধব্যের অতৃপ্তি কিরণময়ী বা বিনোদিনীকে উদ্দেশ্যহীন করে তুলেছে।

অথচ সতী নারীর ইমেজ তৈরিতে লেখক কোন কার্পণ্য করেননি। শত লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা সত্ত্বেও স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম; এই হল সতীত্বের ধারণা। এই সতীত্বের সবচেয়ে বড্ড উদাহরণ অন্নদাদিদি। অন্নদাদিদির বর্ণনায় শরৎচন্দ্র লেখেন, 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।' স্বামীর প্রতি অন্নদা এতটাই একনিষ্ঠ যে সেই স্বামীর জন্যই সে কুলত্যাগিনী হয় এবং সেই কলঙ্ক সে বয়ে নিয়ে চলে। অন্নদাদিদিকে দেখেছিল বলেই শ্রীকান্ত নারীর কলঙ্কে সহজে বিশ্বাস করত না। 'গৃহদাহ'র অচলার ঘর ভেঙেছিল ঠিকই, অচলা সম্পর্কেও অনেক ভ্রান্তি তৈরি হওয়ার অবকাশ ছিল, কিন্তু অচলা শেষপর্যন্ত স্বামী মহিমের প্রতিই ছিল অবিচলিত। অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে অচলা ছিল সতী। 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসেও বিরাজকে ভয়ানক যাতনা সইতে হয়েছে স্বামীর কাছ থেকে। পাকেচক্রে বিরাজ গৃহত্যাগ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার সতীত্বের অবমাননা ঘটেনি। অথচ তাকে জীবন পণ রেখে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের শুরুতেই কুসুম স্বামীর অবিচারের প্রতিবাদ করেছিল। স্বামী বৃন্দাবন তার দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পরে পরিত্যক্ত প্রথম স্ত্রী কুসুমকে আবার গ্রহণ করতে চাইলে কুসুম বলেছিল, 'আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেড়াল পেয়েছ যে, যা ইচ্ছে হবে, তাই করবে? খআমার স্বামী মরেছে, আমি বিধবা।' কারণ স্বামীর পরিত্যাগের পরে কুসুমের মা তার সঙ্গে এক বৈরাগীর হয়ত বা কণ্ঠী বদল বরিয়েছিল এবং তারপর বৈরাগীটি মারা যায়। ফলে কুসুম নিজেকে বিধবা হিসেবে প্রতিপন্ন করে গভীর আত্মসম্মানে। উপন্যাসের শেষে সেই সেই কুসুম বৃন্দাবনের কাছে আত্মনিবেদন করে। এভাবেই সতীত্বের একটা ধারণা করে দেন শরৎচন্দ্র।

১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে যা লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র, সেগুলির মধ্যে সক্রিয় হয়ে আছে তাঁর রাজনীতিবোধ। 'পথের দাবি' উপন্যাসে তার প্রকাশ সর্বাধিক, তবে 'দেনাপাওনা' উপন্যাসেও তার প্রমাণ মেলে। কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার সুবাদে গণ-আন্দোলন সম্পর্কে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন। চাষীর ওপর জমিদারের অত্যাচারের সংবেদনশীল বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজতান্ত্রিক ভাবনার আভাস মেলে। বস্তুত শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' বইয়ে আছে, জমিদারি-লোপ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন যেসব ভাবনার স্ফূরণ দেখা গেল, তা নিয়ে যে সব বৈঠকগুলি হল, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল শরৎচন্দ্রের। বাংলায় একটি সোসালিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা ঠিক করে দেন তিনিই। ফলত 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে জনিদার-চাষির সংঘাতে চাষিদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কথা বলেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার চেয়ে অনেক মুখ্য হয়ে যায় অলকা তথা ষোড়শী-জীবানন্দের সম্পর্ক। ষোড়শীকে মর্মান্তিক ভাবে পরক্ষা দিতে হয় সতীত্বের। অত্যাচার জর্জর অলকা অক্লান্ত সেবায় সুস্থ করে তোলে স্বামী জীবানন্দকে। এতে চণ্ডীর ভৈরবী অলকার কুলটার কলঙ্ক জুটল, তবু সে নিরুপায়, স্বামীর প্রতি একাগ্রতা যে কোন নারীরই কর্তব্য; এমনই ভাবনায় 'দেনাপাওনা' তৈরি হয়।

ঠিক এতটা না হলেও 'পথের দাবি' উপন্যাসেও এই মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন একটা বড় জায়গা নিয়ে রয়েছে। ১৯২৬ খ্রিস্টাধে একাশিত হয় 'পথের দাবি'। গ্রন্থাকারে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছে প্রকাশ করেন সরকার অ্যান্ড সন্স-এর স্বত্বাধিকারী সুধীরচন্দ্র সরকার, কিন্তু কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে চেয়েছিলেন তিনি। লেখক রাজি হননি। শেষপর্যন্ত রমাপ্রসাদ এবং উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে বইটি ছাপা হয় কটন প্রেসে। প্রকাশ পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বাজেয়াপ্ত হয় বইটি। এ নিয়ে যথেষ্ট তোলপাড় শুরু হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ বইটি সম্পর্কে তাঁর আপত্তি জানিয়ে চিঠি লেখেন কয়েক মাস পরেই। তাঁর মতে, 'বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। ...আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম; আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম; একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। ...শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া ক্ষমা।' বলাবাহুল্য এই চিঠি খুবই আহত করেছিল শরৎচন্দ্রকে। এর উত্তরে যে-চিঠিটি লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র, তা অবশ্য পাঠানো হয়নি। তবে চিঠিতে তিনি তাঁর ক্ষোভ এবং অভিমান প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, তিনি সত্য কথা বলায় ইংরেজের এই অপ্রসন্নতা, ...'আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে, অবিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ, নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন, এ দুরাশা আমার

না। ... যা উচিত বলে মনে করি তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না।' এমন একটি সম্ভাবনাময় উপন্যাসেও প্রেমের অনেক টানাপাড়েন অকারণ অনেক জায়গা জুড়ে রয়েছে। অপূর্ব, ভারতী, শশীকবি, নবতারা; এদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক জায়গায় একটু বেশিই গুরুত্ব পেয়েছে। এমনকি সব্যসাচী এবং সুমিত্রার মধ্যে যে সুপ্ত নীরব বোঝাপড়া; সেটাও উপন্যাসটিকে মনোরম করেছে। এর ফলে রাজনীতি প্রসঙ্গটি সবসময় যথাযথ মূল্য পায়নি।

একবার একটি সাহিত্য অধিবেশনে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, সাহিত্যসেবাই তাঁর পেশা। বিশেষত উপন্যাসেই তার আগ্রহ। এটাও বলেছিলেন, 'গোটা দুই শধ আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, Idealistic and Realistc. আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশি। অথচ কি করে যে এই দুটোকে ভাগ করে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। বাস্তবকে তিনি উপেক্ষা করতে চান না; কিন্তু বাস্তব-অবাস্তবের মেলামেশার 'কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে; সে কথা জানেন কেবল লেখকই। সুনীতি-দুর্নীতিকে গুরুত্ব দেন না লেখক, কারণ সাহিত্য কোন নীতিগ্রন্থ নয়। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীর মর্মান্তিক পরিণতি পছন্দ হয়নি শরৎচন্দ্রের। তাঁর মনে হয়েছিল, পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর এই মারা-যাওয়াটা সাহিতের পক্ষে অনুপযুক্ত। হিন্দু সমাজ অবশ্য পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু যেটা সবচেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন; নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম? তার পরিণতি কি হল? বঙ্কিমচন্দ্র নীতির কোপে সাহিত্যকে জলাঞ্জলি দিলেন। এর ফলে মৃত্যু হল সত্য ও আর্টের। তাঁর সিদ্ধান্ত, 'উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙালিতে তার মরা চলে না।' শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর রমা এজন্য গাল খেয়েছিল। এ গাল তো আসলে সাহিত্যের নয়, সমাজের। শরৎচন্দ্র সমাজ সংস্কারক হতে চাননি, সাহিত্যের সে দায়ও নেই। তিনি এমন কথাও বলেছেন, 'পুরুষের তত মুশকিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা-প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। শরৎচন্দ্র চেয়েছেন একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা দিতে। বলেছেন, সতীত্বের ধারণা চিরদিন নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়? আবার তাঁর মতে সাহিত্যের অনেক কাজের মধ্যে একটি কাজ জাতিগঠন এবং দ্বিতীয়টি ভাষা ও জাতির কল্যাণকর কিনা সেটাও বিবেচ্য বিষয়।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রভাবনায় তাই নিছক realistic দৃষ্টিক্ষেপ অনুপস্থিত। realistic শব্দটি, তার কাছে যে দুর্নাম। বরং idealism-ই তার বেশি অভিপ্রেত। দুয়ের মেশামেশিতে তার ঝোঁক ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ওই ভাববাদিতাতে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন তাঁর চরিত্রায়নে। ব্যথা-ভালোবাসা-বুকের রক্ত দিয়ে নির্মাণ করেছেন যাদের, অনেক সময় উপন্যাসে তারা তাদের ভালোবাসার জোরে জিতে গেছে; যেমনটা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধারণ মেয়ে' কবিতায়। ফলে উপন্যাস এগিয়ে যায় ঝোড়ো হাওয়ার গতিতে; অনেক ঘটনা তার ক্রম হারায়, যুক্তি লঙ্ঘিত হয়, কিন্তু ইচ্ছাপূরণ ঘটে যায়। শরৎবাবুর মেয়েরা জীবনের রূঢ়তায় পর্যুদস্ত হয় না, সর্বদাই প্রেমে মহীয়সী হয়ে থাকে। তাদের স্বাতন্ত্র্য শুধু উন্মীলিত হয় তাদের প্রেমে। শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে প্রেমে, যে প্রেমে কলঙ্কিত হতে তাঁর এতটুকুও আপত্তি ছিল না, সেই প্রেমে রঞ্জিত তাঁর মেয়েরা একাগ্রতায় বা একনিষ্ঠতায় তারা আসলে প্রত্যেকেই সতী, তাদের ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্বের সংকট মিটে যায় এই একনিষ্ঠতায় বা বলা যায় 'সতীত্বে'। ভালোবাসার কোন আবমাননা করে না তারা। রোহিণীর মতো গুলি খেয়ে হয়ত মরে না শরৎবাবুর নায়িকারা, কিন্তু তাদের সমাজ-অননুমোদিত প্রেম কিন্তু গৃহীত হয় না সমাজে। রোহিণী গুলি খায়, কিরণময়ী আধপাগলা হয়ে মর্মান্তিক কোন মুহূর্তে অঘোরে ঘুমোতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের যে অভিযোগ, সেই নীতিকে কিন্তু তিনি নিজেও অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'কী করে জিতিয়ে দেবে?

উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।

তুমি হয়ত ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে পথে।

দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।'

এভাবেই জিতেছে; ৗ৩৯;আত্ম-অচেতন' পুরুষমানুষকে ভালোবাসার মধ্যে তারা খুঁজে পেয়েছে জীবনের

সার্থকতা শুধুই একাকার হয়ে গেছে সতীত্ব এবং একনিষ্ঠ প্রেম। তাই শরৎবাবুর মেয়েরাও শুধুই সেবাপরায়ণ, স্নেহশীল, সহনশীল। ❐

# মৃণাল সেন : আজন্ম বিপ্লব পিয়াসী এক চলচ্চিত্রকার

তানভীর মোকাম্মেল

মৃণাল সেনের ছবি দেখে বড় হয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে ওঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম ঘনিষ্ঠভাবে। অনেক স্নেহ-ভালোবাসাও পেয়েছি। ফলে খুব নৈর্ব্যক্তিকভাবে মৃণালদা বা ওঁর ছবি সম্পর্কে আলোচনা বা মূল্যায়ন আমার পক্ষে করা কিছুটা কঠিন। তবু আমি চেষ্টা করব।

সবাই জানেন যে মৃণাল সেনের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে। ফরিদপুর শহরে ওঁদের বাড়ীটা এখনও রয়েছে। পড়েছেন ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে। তারপর যুবক বয়সে এসেছিলেন কলকাতায়।

গত শতকের চল্লিশ দশকে মৃণাল যখন কলকাতা মহানগরে পা রাখলেন এ শহর তখন নানা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে উত্তাল। প্রথম জীবনে কলকাতায় মৃণালদাকে খুবই সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সেসব দিনের অনেক গল্প বলেছেন আমাদের। খুবই স্বল্প পয়সায় টিউশনি করে, প্রুফ রীডিং করে চলেছেন, দারিদ্র্যকে চিনেছিলেন খুব কাছ থেকেই। ঋত্বিকের 'সুবর্ণরেখা'-র চরিত্রটা বলেছিল এক প্রজন্মের কথা, যারা দেশভাগ দেখে 'প্রতিনিধি'। তবে মৃণালদাকে দেখেছি এসব ছবির ব্যাপারে আলাপে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। তেমন আলোচনাও করতে চাইতেন না। আসলে হয়তো তখনও মৃণাল সেন নিজের শিল্পী সত্ত্বাটাকে তেমনভাবে খুঁজে পাননি।

সেদিক থেকে মৃণাল সেনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ছবি 'বাইশে শ্রাবণ' (১৯৬০)। এ ছবিতে অনেকটা জুড়েই রয়েছে পঞ্চাশের সেই ভয়াবহ মন্বন্তরের কথা। ততদিনে অবশ্য বৃটিশদের বিদায়ের সুর শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশবাদের জন্যে চিরকালের জন্যে এ এক চরম গ্লানির বিষয় হয়ে রইল যে বাংলায় তাদের শাসনকালটা শুরু হয়েছিল একটা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দিয়ে- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যে দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গিয়েছিল, যে অমানবিক দুর্ভিক্ষের বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র অমর করে এঁকেছেন ওঁর তআনন্দমঠদ উপন্যাসে। আর বৃটিশদের রাজত্ব শেষও হোল আরেকটা করুণ দুর্ভিক্ষের পর- পঞ্চাশের মন্বন্তর, যে দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় তিরিশ লক্ষ অসহায় নারী-পুরুষ-শিশু প্রাণ হারিয়েছিল। কলকাতার পথে পথে তখন ভেসে বেড়িয়েছে 'মা-এট্টু-ফ্যান-দাও' বলে বুভুক্ষ নর-নারী-শিশুর করুণ আর্তনাদ। গলিতে, রাস্তায়, মানুষের বাড়ীর সামনে, কেবল অসহায় বুভুক্ষু মানুষদের লাশ! একজন সংবেদনশীল শিল্পী হিসেবে এ দুর্ভিক্ষটা বোধহয় মৃণাল সেনকে খুবই তাড়িত করেছিল। আগেই বলেছি যে ওঁর তআকালের সন্ধানেদ, 'কলকাতা ৭১'-য়ের মতই তবাইশে শ্রাবণদ ছবিটাতেও পঞ্চাশের মন্বন্তর বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে থেকেছে। দুর্ভিক্ষ বারবারই এসেছে ওঁর ছবিতে, একটা leit motif -য়ের মতোই। মৃণাল সেনের মতো বাংলার এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে এতগুলো চলচ্চিত্র এদেশের আর কোনো চলচ্চিত্রনির্মাতাই তৈরী করেননি।

আর এদেশের মানুষদের জীবনের প্রকৃত বাস্তাবতাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মৃণাল সেন দারিদ্র্য দেখাতে মোটেই কার্পণ্য করেননি। দারিদ্র্য সর্বগুণবিনাশী, মানবতার দুশমন। দারিদ্র্যের এই বিমানবিক রূপটাকে মৃণাল সেন ওঁর ছবির পর ছবিতে তুলে ধরেছেন বিশদে ও গভীর আন্তরিকতায়-'ওকা উরি কথা', 'কলকাতা ৭১', 'আকালের সন্ধানে'। এসব ছবিতে দারিদ্র্যই যেন ভিলেন যা মানুষের সব ইতিবাচক ও মানবিক সম্ভাবনাগুলোকে নষ্ট করে দেয়।

এল ১৯৬৯ সাল। মৃণাল সেনের শিল্পীজীবনের এক ব্যতিক্রমী বছর। কারণ এ বছর উনি সৃষ্টি করলেন কেবল ওঁর নিজের নয়, ভারতবর্ষেরই এক ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র-তভুবন সোমদ। 'ভুবন সোম' নির্মাণের শৈল্পিক দক্ষতা মৃণাল সেনকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেল। ঘরোয়া আসরে মৃণালদা মাঝে মাঝে বলতেন; 'দুই সোম আমার জীবন পাল্টে দিয়েছে-ভুবন সোম আর গীতা সোম'। গীতা সোম মানে গীতা বৌদি যিনি নিজ যোগ্যতাতেই ছিলেন একজন অসামান্য অভিনেত্রী। অনেকে যে 'ভুবন সোম' ছবিটাকে ভারতের নবতরঙ্গের প্রথম ছবি বলেন সেটা খুব একটা ভুল বলেন না। খুবই স্বল্প বাজেটে তৈরী 'ভুবন সোম' চলচ্চিত্রটা নির্মাণের বৈচিত্র্যে, চরিত্রায়নের বৈশিষ্ট্যে, লোকেশনের ব্যবহারে, অভিনয়ের প্রসাদগুণে, শুধু মৃণাল সেনের সৃষ্টি সম্ভারেই নয়, ভারতীয় সিনেমাতেও এক মাইলফলক চলচ্চিত্র হয়ে রইল। সরল এক গ্রাম্য তরুণীর কাছে দোর্দন্ডপ্রতাপ এক আমলা ভুবন সোমের পরাজয় যেন কেবল কোনো ব্যক্তি অহংয়ের পরাজয় নয়, স্নেহ-মমতার কাছে আমলাতন্ত্রের পাথুরে নির্মমতার পরাজয়। আর কী অসামান্য অভিনয়! কেউ কী কখনো ভুলতে পারবে ভুবন সোমরূপী উৎপল দত্তের অনন্য অভিনয়! উপনিবেশ-উত্তর

আমলাতন্ত্রের আত্মম্ভরিতাগ্ধ চলনে, বলনে, পোশাকে। কিম্বা সরলা গ্রাম্যতরুণী হিসেবে সুহাসিনী মুলের সাবলীল পর্দা-উপস্থিতি।

রেলওয়ের খুব বড় কর্তা ভুবন সোমের সুট-টাই পরা পোশাকটাই যেন স্বাধীন ভারতের নব্য শাসকদের এক প্রতীক। এবং এক চোখা ঠাট্টাও! অনেকটাই যেন চ্যাপলিনের সেই ঢোলা প্যান্ট ও বাউলার হ্যাট পরে 'ভদ্দরনোক' সাজার চেষ্টা! কিম্বা শেক্সপীয়ারের তকিং লীয়ারদ-য়ে যেমনটা বলা হয়েছিল 'টেইলার-মেড-ম্যান'; দর্জিতে বানানো মানুষ! অন্তসারশূন্য পোশাকসর্বস্ব এক ফাঁপা মানুষ। তবে ভারতবাসীদের ইংরেজদের মত পোশাকে নিজেদেরকে সজ্জিত করার বিষয়টা হাল্কা করে নেবার সুযোগ নেই। মনে আছে নিশ্চয়ই 'ইন্টারভিউ' ছবিটার যুবকটার দুখজনক পরিণতির কথা। তার আর সব যোগ্যতা থাকলেও চাকুরীটা সে পায়নি। কারণ ওদিন লন্ড্রী বন্ধ থাকাতে ও সুট-কোট পরে ইন্টারভিউয়ে যেতে পারেনি। বেচারা সেদিন বাঙ্গালীর পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবী পরে গিয়েছিল। চাকুরীটা ওর হয়নি!

'বাইশে শ্রাবণ', 'কলকাতা ৭১', 'ইন্টারভিউ', 'ভুবন সোম' মৃণাল সেনের একটার পর একটা এরকম ছবি আমাদের যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে তা হচ্ছে দুই শ' বছরের উপনিবেশ শাসনোত্তর এক কলুষিত রাষ্ট্র ও সমাজ, যে রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি, অপশাসন, শ্রেণী শোষণ ও অমানবিকতা। মৃণাল সেনের ছবিতে পাই সর্বগ্রাসী এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মানবিক মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকার, বেঁচে থাকার, অস্তিত্বের লড়াইয়ের চিত্র।

কখনো কখনো মৃণাল সেন যেন অতীতের প্রতি কিছুটা স্মৃতিমেদুরও হয়ে পড়েন। ওঁর কিছু ছবি তুলে ধরে এক সময় ঐতিহ্য ছিল, সম্পদও ছিল। এখন শুধুই শূন্যতা-' খন্ডহর', 'বাইশে শ্রাবণ', 'আকালের সন্ধানে'।

সাহিত্যনির্ভর একরৈখিক টালিউডীয় বাংলা সিনেমা বানাননি মৃণাল সেন। পরিবর্তন চেয়েছেন কেবল বিষয়বস্তুতে নয়, প্রকরণের ক্ষেত্রেও। কলকাতার তৎকালীন স্টুডিও কেন্দ্রিক 'টকীজ' চলচ্চিত্রের সরল ভাষাকে ভাঙতে চেয়েছেন, খুব সাহসের সঙ্গেই বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন আধুনিক চলচ্চিত্রের বৈচিত্র্যময় ভাষার। আর শুধু বাংলা ভাষায় নয়, ছবি করেছেন বিভিন্ন ভাষাতেই- তেলেগু (ওকা উরি কথা), উড়িয়া (মাটির মনিষ), হিন্দী (ভুবন সোম, একদিন আচানক), ইংরেজীতে (জেনেসিস)। বারবার যেন নিজেকেই অতিক্রম করে যেতে চেয়েছিলেন মৃণাল সেন।

তাই কেবল বিষয়বস্তু নয়, আঙ্গিকটাও মৃণাল সেনের কাছে থেকেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কী বলা হচ্ছে শুধু তা নয়, কীভাবে বলা হচ্ছে, সেটাও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে। কখনো ফ্রীজ শট, কখনো ফ্লাশব্যাক, কখনো মাস্কিং, কখনো সাউন্ডট্রাকে ধারাভাষ্য পাঠ, কখনো নিউজপেপার কাটিং, কখনো বা অ্যানিমেশন, চলচ্চিত্রের আঙ্গিকগত সব রকম নিরীক্ষারই ব্যবহার করেছেন সমানে। আর করেছেন প্রচুর ইম্প্রোভাইজেশন। প্রায় সব ছবিতেই। তাই মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র যেন হয়ে ওঠে, এক ধরণের কোলাজ ফিল্ম, যার সেরা উদাহরণ হতে পারে '১৯৭১' ছবিটা। তবে কী-না যে তাপে অন্ন মিষ্ঠ, সে তাপে ব্যঞ্জন নষ্টও হতে পারে। যে প্রকরণ একবার এক ছবিতে সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আরেক ছবিতে শৈল্পিকভাবে তা তেমন সফল না-ও হতে পারে। পুনরাবৃত্তির কিছু ঝোঁকও ছিল ওঁর। ফলে Cliche-র অভিযোগ উঠেছে মৃণাল সেনের কোনো কোনো দৃশ্য বা প্রকরণের বিরুদ্ধে। মৃণালদার কোনো কোনো চলচ্চিত্রিক নিরীক্ষার বিরুদ্ধে উঠেছে Gimmick-য়ের অনুযোগও।

আসলে মৃণাল সেনের সিনেমা হচ্ছে 'সিনেমা অব আইডিয়াজ'। কাহিনীটা সব সময় মুখ্য নয়। বলবার কথাটা, থিসিস- টাই মূল। অনেক সময়ই কাহিনীটা এসেছে, বা তৈরী করে নেয়া হয়েছে, মূল আইডিয়াটাকে তুলে ধরার অনুষঙ্গ হিসেবে মাত্র। একটা ব্যাপারে ভারতবর্ষের সিনেমা মৃণাল সেনের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ রইবে। এদেশে তিনিই ছিলেন পাইওনীয়র। আর তা হচ্ছে কাহিনীর সরল একরৈখিক বয়ানকে ভেঙ্গে আধুনিক সিনেমা আঙ্গিকের নানা নিরীক্ষার মাধ্যমে বলার কথাগুলো পর্দায় তুলে ধরা।

ওঁর ছবির পর ছবিতে যে পাথুরে দেওয়ালটার সামনে মৃণাল সেন আমাদের এনে দাঁড় করান, তা হচ্ছে সমাজ; শ্রেণীবিভক্ত। মুন্সী প্রেমচাঁদের 'কাফন' গল্পটার কী চমৎকার দৃশ্যায়নই না করলেন 'ওকা উরি কথা'-তে। মূল চরিত্রটা বলছে, শ্রম করা বৃথা। কারণ তা' সম্পদশালীর সম্পদ বৃদ্ধি করে মাত্র। এ যেন প্রুঁধোর কথারই পুনরাবৃত্তি! সম্পদ মানেই চুরি। অপরের শ্রম চুরি। এ সমাজ যে দাঁড়িয়েই আছে শ্রম চুরি আর শ্রম শোষণের উপর সেটা তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি মৃণাল সেন।

আসলে যেখানে শোষণ সেখানেই মৃণাল সেন প্রতিবাদী। 'মৃগয়া', ওঁর প্রথম রঙীন ছবিটাতেও মৃণাল সেন দেখালেন সিধু ও কানুর বিদ্রোহের ইঙ্গিত। দেখিয়েছেন আদিবাসীদের সারল্যকে কীভাবে শোষণ করে উপনিবেশবাদ ও ধুরন্ধর নাগরিক শ্রেণী। আর '১৯৭১' ছবিটার তিনটে পর্বেই খুবই তীক্ষ্মভাবে এনেছেন 'হ্যাভ' আর 'হ্যাভ

নট'-দের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব, কুড়ি বছরের এক তরুণের গল্পের মধ্য দিয়ে, যে তরুণটিকে গুলি করে মারা হয়।

মৃণাল সেন সম্পর্কে এই অভীধাটা বহুল প্রচারিত; 'মার্কসবাদী'। মৃণাল সেন নিজেও দীর্ঘদিন একজন মার্কসবাদী হিসেবে পরিচিত হতে পছন্দ করেছেন। মার্কসবাদের থীসিস-অ্যান্টি থীসিস-সিনথেসীস তত্ত্বের এক প্রায় টেক্সট বই উপস্থাপনা দেখি ওঁর তজেনেসিসদ ছবিটাতে। এক বিরল প্রান্তরে এক কৃষক, এক তাঁতী ও এক রমণীর গল্প। একজন মহাজনও আছে যে মাঝে মাঝে আসে এবং শোষকদের 'ভাগ কর ও শাসন করদ নীতি অনুযায়ী কৃষক ও তাঁতী পুরুষটার মাঝে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দেয়। সে উপলব্ধি ঠিকই ধরা পড়ে রমণীটার মনের ছায়ায়। বলে তুতোমাদের মনে লোভ জেগেছে।' সেই লোভ, সেই প্রফিট মোটিভ, যা মানবসভ্যতার এক বড় অশুভের মূল। তবে শুধুই কেতাবী মার্কসবাদ নয়, মৃণাল সেনের কাছে যেন, বিশেষ করে ওঁর শেষ জীবনের ছবিগুলোতে, বড় হয়ে থেকেছে; সহমর্মিতা। বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের প্রতি সুগভীর ও আন্তরিক এক সহমর্মিতা।

মৃণাল সেনের সৃষ্টিকর্মে তভুবন সোমদ যেমন ছিল এক মাইলফলক, তেমনই আরেক মোড়ফেরা ছিল 'একদিন প্রতিদিন' (১৯৭৯) ছবিটা। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকে, বা আরো সঠিকভাবে বললে মূল্যবোধের সঙ্কটকে, সুনিপূণ এক দক্ষতায় যেন তুলে আনলেন মৃণাল সেন। যৌন-নৈতিকতা নিয়ে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পুরুষদের বড়ো রকম দ্বিচারিতা আছে। বাড়ীর একমাত্র উপার্জনক্ষম অবিবাহিতা তরুণী মেয়েটা রাতে বাড়ীতে ফেরেনি। বাবু নবীন মল্লিকের স্যাঁতসেতে পুরনো বাড়ীটায় সময় যেন তাই আতঙ্কে থমকে যায়। ছেলে হলে হয়তো বিষয়টা অন্য রকম হোত। তবে নারীর অধিকারবোধ এবং মৃণাল সেনের আধুনিকমনস্কতা, ও প্রগতিশীলতাও, যেন মেয়েটার মুখের ওই একটা বাক্যতেই মূর্ত হয়ে ওঠে তআমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে। 'যুবতী নারীর শরীর, যে ব্যাপারে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারে পুরুষতান্ত্রিকতার যে নিয়ন্ত্রণ- মানসিকতা, বা 'ভদ্রলোক' থাকা না-থাকা নিয়ে সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্ব, মধ্যবিত্তের এইসব সূক্ষ্ম অনুভূতি অসামান্য এক দক্ষতায় এ ছবিতে তুলে ধরলেন মৃণাল সেন। ছবিটাতে গীতা সেন ও শ্রীলা মজুমদারের সংবেদনশীল অভিনয়ও হয়ে রইবে সুদীর্ঘকাল স্মরণীয়। অসামান্য কিছু দৃশ্য ও শট আছে ছবিটাতে। শেষ ফ্রীজ শটটার কথাই ধরা যাক। মেয়েটা ফিরে এসেছে। পরদিন ভোর। সাউন্ডট্রাকে আমরা একটা বিমানের উড়ে যাওয়ার শব্দ পাই। যেন কোনো সুদূরের হাতছানি। আর পর্দায় দেখি জানালার শিকের মাঝ থেকে রান্নাঘরে গীতা সেনের ফ্রীজ শটটা। যেন বন্দী। পালানোর কোনো পথ নেই। জীবন চলতে থাকবে এভাবেই!

মধ্যবিত্তের নৈতিকতার এই দ্বিচারিতা আরো বেশী ফুটে উঠতে দেখি তথারিজদ ছবিটাতে। গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রীর অসাবধানতায় দরিদ্র শ্রমজীবী বালক পালানের মৃত্যুর পর মধ্যবিত্ত গৃহকর্তা নৈতিকতার প্রশ্নে নানারকম দ্বিচারিতা দেখালেও গ্রাম-থেকে-আসা পালানের শ্রমজীবী পিতা যে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করে, তাতে মধ্যবিত্তের নৈতিকতার মূল্যবোধগুলো যে কত ঠুনকো তা ফুটে ওঠে পরিষ্কার। মৃণাল সেন দেখিয়ে ছেড়েছেন যে মানবতার প্রশ্নে এ মধ্যবিত্তের কাছে খুব বেশী প্রত্যাশা না করাই ভালো। তবে কী না, সমাজে অন্য শ্রেণীও আছে। শ্রমজীবী শ্রেণী, যারা অনেকটাই এই দ্বিচারিতা থেকে মুক্ত। ভুলে গেলে চলবে না মৃণাল সেন বিশ্বাসে বরাবরই ছিলেন একজন শ্রেণীসচেতন মার্কসবাদী।

বাড়ীতে আরো একজন ফেরেনি। না, কোনও তরুণী নারী নয়, এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ। একজন অধ্যাপক। এখানে যুবতী নারীর শরীর নয়, আরো গভীরতর এক আস্তিত্বিক প্রশ্নই যেন জড়িত। সেই জীবনান্দীয় অস্তিত্ব-সংকটই যেন তরক্তের মাঝে আরো এক বিপন্ন বিস্ময়দ! যখন মধ্যবিত্ত বুঝতে পারে তার জীবনের মিডিওক্রিটিক অস্তিত্ব, বুঝতে পারে জীবনে তার বড় কিছু দেবার বা পাবার নেই। তার জীবনের আসলে বড় কোনো অর্থই নেই! ওই যে মেয়েটা বলেছিল; 'বাবা বুঝতে পেরেছিল বাবা খুব সাধারণ। আর সাধারণ হিসেবে জীবন কাটানো খুব কষ্টকর। বাবা আর ফিরবে না, দেখিস্।' ঠিকই বুঝেছিল মেয়েটা!

তবে মৃণাল সেনের সেরা এক চলচ্চিত্র সর্বদাই হয়ে রইবে- 'আকালের সন্ধানে'। ওঁর অভিজ্ঞতায় দেখা পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে এক কালজয়ী ছবি। 'আকালের সন্ধানে' পুরোপুরিই "A film within a film", যে নিরীক্ষাটা ইউরোপের নবতরঙ্গের নির্মাতারা অনেকেই করেছেন। কিন্তু বিশ্বের খুব কম চলচ্চিত্রনির্মাতাই মৃণাল সেনের মতো ভেতরের ফিল্মটাকে বাইরের কাহিনীটার সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে মেলাতে সফল হয়েছেন। তবে 'আকালের সন্ধানে' কেবল তো আঙ্গিকের নিরীক্ষায় নয়, বিষয়বস্তুর মানবিকতাতেও, চিরকালই বাংলা তথা ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ এক চলচ্চিত্র হয়ে রইবে।

মৃণালদার 'খন্ডহর' (১৯৮৩) হয়তো সবচে অ-মৃণালীয় ছবি। শ্রেণীর সংঘাত নেই, দারিদ্র্যের নির্মমতা নেই, অথচ সবচে বিষন্ন এক ছবি। এক বিশাল ভগ্নস্তুপে বিষন্ন এক

নারীর করুণ জীবনগাঁথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটাকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেলেন মৃণাল সেন। খুবই সংবেদনশীল ও মানবিক এক চলচ্চিত্র।

রাজনীতি, বিশেষ করে বাম রাজনীতি, সব সময়ই ছিল মৃণালদার প্রিয় এক বিষয়। তমহাপৃথিবীদ ছবিটার কথাই ধরুন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়েছে। বিলীন হয়ে গেছে বার্লিনের দেয়াল। বদলে যাচ্ছে পূর্ব ইউরোপ। বাড়ীর ছেলেটা নক্সাল আন্দোলনে মৃত। ছেলে, তার মা, গোটা পরিবারটা, গোটা এক প্রজন্মই তো এক সময় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস রেখেছিল এক সমাজবিপ্লবে। এত ত্যাগ, এত তিতীক্ষা, সবই কি বৃথা যাবে! মায়ের ডায়েরীতে আমরা যেন পাই আমাদেরই যৌথ আকুতি; 'বুলু, তোরা কী সব মিথ্যে হয়ে যাবি'!

পশ্চিমারা অনেকেই মৃণাল সেনের মূল্যায়নে "Radical"– "Marxist"– "Doctrinaire" এসব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। সেসব লেখা আমরা পড়েছিও। কিন্তু একথা তো তারাও অস্বীকার করতে পারেননি যে মৃণাল সেন সবার উপরে ছিলেন একজন শিল্পী। একজন রাগী সৃজনশীল শিল্পী যিনি ছবির পর ছবিতে দর্শকের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন দর্শকের বিবেচনাবোধকে; '১৯৭১', 'একদিন প্রতিদিন', 'খারিজ', 'ইন্টারভিউ'। আর মোক্ষম সব প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জ! ওঁর ছবিগুলাতে ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার প্রতি এমন সব তীর্যক প্রশ্ন মৃণাল সেন রেখে গেছেন যেসব প্রশ্নের উত্তর এই সমাজ ও রাষ্ট্রকে দিতে হবে। টিকে থাকতে হলে।

আসলে মৃণালদার সঙ্গে আমরা এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম যে ওঁর কাজকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন। তবে আমাদের একটা দুঃখের কথা ওঁকে বলেছিলাম। তা' হচ্ছে; তআপনি দেশভাগ দেখেছেন। দেশভাগের শিকারও। দেশভাগ নিয়ে কেন আপনি কোনো ছবি তৈরী করেন না?দ তখন মৃণালদা এত জোরে মাথা নেড়ে বলেছিলেন; তনস্টালজিয়া! ওসব আমার নেই।দ ওঁর বলার ভঙ্গীতেই বুঝেছিলাম কত অজানা এক বেদনা ওঁর মনে রয়েছে এবং কত গভীরভাবেই তা' বাজে! বাস্তবেও দেখেছি। একটা ঘটনার কথা বলি। ফরিদপুর শহরে ওঁরা যে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিলেন সেখানে পুকুরপারে ওর বোন রেবার সমাধি ছিল। মৃণালদাকে আমরা একবার ফরিদপুরের ওই বাড়ীটাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ও বাড়ীটাতে এখন যারা থাকেন তাঁরা মৃণালদাকে ওঁর বোন রেবার সমাধিটা দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটা তারা ভাঙ্গেননি। ওরকমই রেখে দিয়েছেন। সে সময়ে এত যে শক্ত মানুষ মৃণালদা ওঁর চোখেও আমরা জল দেখেছি! দেখেছি ফেলে যাওয়া সব কিছুর প্রতি এক সুগভীর অন্তহীন বেদনা! বাংলাদেশ ও আমাদের বাংলাদেশীদের যে কোনও ব্যাপারে সহায়তা করার জন্যে মৃণালদা সর্বদাই থাকতেন সচেষ্ট। মনে আছে আমাদের বন্ধু তারেক মাসুদের 'মাটির ময়না' ছবিটা কলকাতার তনন্দনদ- এ দেখানোর ক্ষেত্রে সমস্যা হলে মৃণালদাকে বলতেই উনি তখনই পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যকে টেলিফোন করেছিলেন। সমস্যাটার একটা সুরাহা হয় এবং ছবিটা কলকাতায় দেখানো সম্ভব হয়। মৃণালদাকে আমরা বাংলাদেশীরা তাই সর্বদাই স্মরণ করে যাব গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

মৃণালদা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে ওঁর মুখে শোনা একটা ঘটনা বলি যা তিনি আমাদেরকে একাধিকবার শুনিয়ে ছিলেন। ঘটনাটা হচ্ছে তখন গীতা বৌদির সঙ্গে মৃণালদার পূর্বরাগ চলছে। মৃণালদা তখন পুরোই বেকার মানুষ। পয়সা জমিয়ে হুইলার থেকে গ্যালাহারের "A Case for Communism" নামে একটা বই কিনেছিলেন। তো সেদিন গীতা বৌদিকে ছাড়তে গিয়েছিলেন বালি ব্রীজে। ওঁর হাতে ছিল সে বইটা। সে বিকেলে মৃণালদা যখন বুঝলেন ওঁর অনুরাগটা একপাক্ষিক নয়, তখন আবেগে বৌদির হাত ধরেছিলেন। আর সেটা করতে গিয়ে ওঁর হাতে ধরা গ্যালাহারের বইটা ব্রীজ থেকে নদীতে পড়ে যায়। মৃণালদা রসিকতা করে বলতেন; 'আমার কমিউনিজমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল'! মৃণাল সেন সংসারী হলেন। ওঁর কমিউনিজমের স্বপ্নের হয়তো গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছিল কিন্তু মৃণাল সেন শেষ পর্যন্তও সমাজপ্রগতিতে বিশ্বাস রেখেছেন অটুট। আর সে লড়াইয়ে ওঁর শিল্পকে কখনোই হারতে দেননি। হয়তো শেষ জীবনে মার্কসবাদে ওঁর বিশ্বাসে কিছুটা টোল খেয়েছিল, বিপ্লবের মত ও পথের ব্যাপারে কিছুটা সংশয়ী হয়েছেন, কিন্তু যুগ যুগ ধরে সামাজিক সাম্যের জন্যে মানুষের যে স্বপ্ন, তা' থেকে কখনোই বিচ্যুত হননি। শেষ পর্যন্তও থাকতে চেয়েছেন আশাবাদী।

আর যারাই আগামীতে মানুষে মানুষে সাম্যের স্বপ্ন দেখবে, সে লক্ষ্যে কাজ করবে, মৃণাল সেনের বিশাল ও বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্র-সম্ভারের কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে বারবারই। ❐

# থার্ড থিয়েটারের রাজনীতি ও বাদল সরকার একটি বিতর্ক

মলয় রক্ষিত

বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার তত্ত্ব আর বাস্তবের তৃতীয় ধারার থিয়েটার-আন্দোলন আদৌ এক নয়;কথাটা বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন বিশাখা রায়। তাঁর মতে বাদল সরকারের 'শতাব্দী' ছিল নিতান্ত একটি 'কোম্পানি' থিয়েটার, সেই কোম্পানি থিয়েটার থেকে শতাব্দীকে সরিয়ে এনে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে তাকে থার্ড থিয়েটার আন্দোলনে পরিণত করার কৃতিত্ব বিশাখা রায় ও তাঁর নকশাল বন্ধুদের। ১৯৬৯-এ শতাব্দী নতুন করে গঠন করা হয়। একাত্তর-বাহাত্তরে অনেক সদস্যই অঙ্গনমঞ্চ রীতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারায় শতাধী ছেড়ে ছলে যান। এই পর্বেই ১৯৭১-এ বিশাখাসহ একদল নতুন ছেলেমেয়ে দলে আসেন;যাঁরা নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। বিশাখার ব্যাখ্যায় 'বৃদ্ধ' বাদল সরকারের সঙ্গে তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের প্রত্যক্ষ সাহচর্যেই বাদলবাবুর তৃতীয় ধারার নাট্যচিন্তায় ও প্রয়োগে রাজনৈতিক মাত্রা যুক্ত হয়। বিশাখা এবং তাঁর নকশাল বন্ধুরা না থাকলে 'মিছিল', 'ভোমা', 'বাসি খবর', 'ভাঙা মানুষ', 'মানুষে মানুষে';এই নাটকগুলি লেখা কিংবা প্রযোজনা করা সম্ভব ছিল না। এই আন্দোলনে বিশাখা এবং তাঁর নকশালপন্থী বন্ধুদের অবদান বাদল সরকার ইচ্ছে করেই কখনও স্বীকার করেননি। কখনও স্বীকার করেননি যে, নকশাল রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংযোগের কথা;যা থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছে;এই অর্থেই বাদলবাবু 'অনৈতিক', এই অর্থেই তাঁকে বিশ্বাসভঙ্গতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন বিশাখা। সেই কথাগুলি ডকুমেন্ট আকারে প্রকাশ করে যেতেই তিনি হয়তো বাদল সরকারের মৃত্যুর পরে কলম ধরেছেন; বই লিখেছেন, অসংখ্য ইন্টারভিউতে তাঁর অপ্রাপ্তির কথাগুলি রিপিটেডলি বলে চলেছেন।১৪

কনটেন্টের বিচারে শতাব্দী প্রযোজিত 'স্পার্টাকুস', 'মিছিল', 'ভোমা', 'বাসি খবর', 'সুখপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস';প্রভৃতি নাটকগুলিকে রাজনৈতিক বোধে সমৃদ্ধ বলা যায়। বাহাত্তরে যখন বাদল সরকার 'স্পার্টাকুস' প্রযোজনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ততদিনে বিশাখা রায় ও তার নকশাল বন্ধুরা শতাব্দীতে যোগ দিয়েছেন।

থার্ড থিয়েটার আন্দোলন নিয়ে বিশাখা রায়ের এই কাউন্টার-থিসিস, দাবি-দাওয়া; নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। একে নকশাল রাজনীতি, তায় প্রেমিকা তথা সহধর্মিণীর কৃতিত্বের কথাকে চেপে যাওয়া;বঙ্গীয় মিডিয়াকুল এই বক্তব্যে একজন লেজেন্ডারি প্রতিভা-কর্তৃক জেন্ডার- এক্সপ্লয়টেশনের গন্ধ পেয়ে, সেটিকে মুনা ফাজনক কনটেন্ট হিসেবে লুফে নিয়ে, দ্বিগুণ উৎসাহে প্রচারে নেমে পড়তে দেরি করেনি। সে প্রচার আজ রীতিমতো অশ্লীলতার পর্যায়ে নেমে এসেছে বললে ভুল বলা হবে না। যাইহোক, এ-প্রসঙ্গে তৃতীয় থিয়েটারের রাজনৈতিক সংযোগ এবং বাদল সরকারের অবস্থানটা আরও একবার যাচাই করে নেওয়া যাক।

কনটেন্টের বিচারে শতাব্দী প্রযোজিত 'স্পার্টাকুস', 'মিছিল', 'ভোমা', 'বাসি খবর', 'সুখপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস';প্রভৃতি নাটকগুলিকে রাজনৈতিক বোধে সমৃদ্ধ বলা যায়। বাহাত্তরে যখন বাদল সরকার 'স্পার্টাকুস' প্রযোজনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ততদিনে বিশাখা রায় ও তার নকশাল বন্ধুরা শতাব্দীতে যোগ দিয়েছেন। এই প্রযোজনায় অংশগ্রহণকারী অনেক সদস্যই শতাব্দী ছেড়ে বেরিয়ে যান। এই সময়েই নাট্যকর্মী হিসেবে বিশাখা ও তাঁর নকশাল বন্ধুদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয় ১৯৭৪-এ অভিনীত 'মিছিল' থেকে। 'মিছিল'-এ 'নতুন বাড়ি' খুঁজে বের করার জন্য বুড়ো যেভাবে খোকার হাত ধরে, কিংবা 'ভোমা'য় যেভাবে শহর-কর্তৃক শোষিত দু-বেলা খেটে না পাওয়া গ্রামের ভোমারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, যেভাবে 'ভোমা' অভিনয়ের জন্য শতাব্দীকে মধ্যবিত্তের অঙ্গনমঞ্চ ছেড়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে; রাঙাবেলিয়ায় মাঠে, খেতে, ডুবো কাদায় নেমে আসতে হয়, যেভাবে 'বাসি খবর'-নাটকে সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রতিবাদের মুখ হয়ে গাঁথা হয়ে যায়;এ সমস্তই বাদল সরকারের সচেতন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতিফলন। বাদল সরকার নিজে কোথাও এই রাজনীতির সংযোগের কথা কি অস্বীকার করেছেন? না, করেননি। বরং তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের দর্শন যে বৃহত্তর অর্থে রাজনৈতিক

এবং সেটা সমাজ-বদলের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত;এই কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। 'ঋতম্' পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় (অক্টোবর ১৯৮১) 'নাট্যবিষয়ক বক্তব্য'-তে একাধিকবার তিনি তৃতীয় রীতির থিয়েটার প্রসঙ্গে এই সমাজ-বদলের কথা বলেছেন। কেন তৃতীয় রীতির থিয়েটার, কেন গ্রামে যাওয়া?;এই প্রশ্নের উত্তরে আছে সেই সমাজ-বদলের গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা;

থিয়েটার বলতে আমরা যেটাকে বুঝি;সেই শহরের থিয়েটারে তার কুলচ্ছে না। যার কাছে সে যেতে চায়, কমিউনিকেট করতে চায়, যার কাছে সমাজ বদলাবার কথা বললে তারা অ্যাকশনে যেতে পারে, কাজের মধ্যে যেতে পারে, সমাজ বদলাবার সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে;তাদের কাছে এই থিয়েটার ক'রে যেতে পারছে না। তাই অন্য থিয়েটারের প্রশ্ন।২

১৯৮১-তে লেখা তাঁর 'থিয়েটারের ভাষা' গ্রন্থের দ্বিতীয় বক্তৃতায় বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে এবং বিস্তারিত বুঝিয়েছেন। বলেছেন; তৃতীয় থিয়েটারের প্রাণ হচ্ছে সমাজকে পরিবর্তিত করবার তাগিদ এবং সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয় যদি মানুষের পরিবর্তন না ঘটে, মানুষের চিন্তা চেতনা ক্রিয়াকর্ম জীবনধারার পরিবর্তন না ঘটে।. . . থিওয়েটার 'রাষ্ট্র বা সমাজের আমূল পরিবর্তন' ঘটিয়ে দেবে, এ ধারণা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু থিয়েটার, বা যে-কোনো শিল্প সাহিত্য। ঐ অসংখ্য ব্যক্তি-বিপ্লবের ক্ষেত্রে কাজ ক'রে যেতে পারে। তৃতীয় থিয়েটার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত থিয়েটার, এবং উদ্দেশ্যটা এই।৩

এখন প্রশ্ন, বাদলবাবুর এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কি বিশাখা রায়ের দাবি অন্যায়ী একান্তভাবেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত? এই প্রশ্নই ১৯৯৩-এ বাদল সরকারকে আরও সুসংবদ্ধভাবে করেছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ;সঙ্গে বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় সাক্ষাৎকারে। সেখানে শমীকবাবু নানাভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, সত্তরে, বাদলবাবুর থার্ড থিয়েটার প্র্যাকটিসটার মধ্যে, গ্রামে গিয়ে থিয়েটার করার মধ্যে যে ধরনের পোলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস আছে;তার পার্স্পেকটিভটা কীরকম, সেটা কোনোভাবে নকশালবাড়ি মুভমেন্ট থেকে এসেছে কি না? শমীকের প্রশ্নের উত্তরে বাদলবাবু কোথাও এ কথা অস্বীকার করেননি যে ব্যাপক অর্থে এটা রাজনৈতিক। তাঁর ভাষায়; আমাদের থিয়েটারটা 'গিয়ার্ড টু সোশ্যাল চেঞ্জ'। 'ইট ডাস নট মীন মাচ';মানে ঐটা খুব এক্সপ্লেন করে না তো। আমি সেখানে যখনই বলেছি খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রত্যেক নাটকে;এই সমাজটা খারাপ, এটা বদলাও, সেটা বলি না।. . . সেখানে আমরা দুটো জিনিস চেষ্টা করি;হয়ে যায় চেষ্টাটা;একটা হচ্ছে এই সমাজটা বলবত রাখার জন্য প্রথম কথা কতগুলো সত্য গোপন করা হয়। যাদের স্বার্থে এই সমাজটা চলে, রাখা, কতগুলো সত্য তারা গোপন করে অথনা বিকৃত করে। এক নম্বর, আর জেনে শুনে কতগুলো মিথ্যা মিথ্স্চালু করে,সেই মিথ-এ আসতে আসতে লোককে বিশ্বাস করিয়ে দেয় যে ওগুলো সত্য। আমাদের থিয়েটারের কাজ হচ্ছে এই যে-সত্যগুলো চাপা দেওয়া হচ্ছে বা বিকৃত করা হচ্ছে বা যেখানে অর্ধসত্য বলা হচ্ছে সেগুলোকে উদ্ধার করে প্রচার করা। আর একটা কাজ হচ্ছে মিথ্গুলো ফাইটকরা। এখন এটা করতেগেলেই কিন্তু অনেকগুলো আসপেক্ট বেরিয়েপড়ে।৪

'আমরা social change করব' এরকম audacity– pretension নিয়ে তো তারা কাজে নামেনি। আমরা meaningful কাজ করছি, এটা অর্থপূর্ণ কাজ করছি। এই সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সংক্রান্ত কাজটা অর্থপূর্ণ মনে করি। এই থিয়েটারের মাধ্যমে সেটা করা যাচ্ছে।'

এই 'আসপেক্ট'গুলোই আপাতভাবে পোলিটিক্যাল, সমাজ-বদলের ব্যাপারে একটা চেতনা;একটা অ্যাওয়ারনেস ছড়িয়ে দেওয়া। বাদলবাবু সেটা মানেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য; 'আমরা social change করব' এরকম audacity– pretension নিয়ে তো তারা কাজে নামেনি। আমরা meaningful কাজ করছি, এটা অর্থপূর্ণ কাজ করছি। এই সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সংক্রান্ত কাজটা অর্থপূর্ণ মনে করি। এই থিয়েটারের মাধ্যমে সেটা করা যাচ্ছে।'৫

বাদলবাবু কিন্তু কোথাও এই পোলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেসকে নকশালবাড়ি মুভমেন্টের প্রভাবজাত কিংবা ওই জাতীয় কোনো বৈপ্লবিক প্রেরণা;এসব বলছেন না, বরং অস্বীকারই করেছেন সারাজীবন। তথাকথিত পার্টি-পলিটিক্সকে, সংসদীয় গণতন্ত্রের কল্যাণময় স্ট্রাকচারে বিশ্বাসী দলীয় রাজনীতিকে তিনি বহু আগেই রিজেক্ট করেছিলেন। নকশালবাড়ি মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর জড়িয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা দূর দূরান্তরেও ছিল না। ২৯ অক্টোবর ১৯৯৪;আনন্দবাজার পত্রিকাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন;'আমার ওপর অনেকগুলো

রবার-স্ট্যাম্প দেওয়া হয়। 'নকশাল' তার মধ্যে একটা। . . . কোনো নকশালবাড়ি অংশের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, যোগাযোগও নেই।'৬

বিশাখা রায়ের বক্তব্যের সূত্র ধরেই, একটি সাক্ষাৎকারে আমি শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ-বিষয়ে জানতে চাই যে; বিশাখা রায় যে দাবি করেছেন, রাজনৈতিক অভিমুখহীন একটা শৌখিন নাট্যচর্চা থেকে বাদলবাবুর থার্ড থিয়েটার আন্দোলনে চলে যাওয়ার পিছনে ছিল নকশাল আন্দোলনের কয়েকজন তরুণ-তরুণীর প্রেরণা ও নকশাল রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। বিশেষত 'মিছিল', 'ভোমা', 'বাসি খবর' বা 'ভাঙা মানুষ'; প্রজিজ্ঞে সভৃতি নাট্য-প্রযোজনার নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় ওই নকশাল রাজনীতির সংযোগই বাদলবাবুর নাটকে রাজনৈতিক অভিমুখ বদলে দিয়েছিল বলে বিশাখা দাবি করেছেন। সে দাবির যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে শমীকবাবু আমাকে বলেন;

বিশাখা রায় বাদলবাবু সম্পর্কে কী বলেছেন, কী দাবি করেছেন, তাঁদের মধ্যে কী ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল আমি জানি না। সে নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। এ বিষয়টার মধ্যেই আমি ঢুকব না। কিন্তু আমি বুঝি না, 'মিছিল' থেকে বাদলবাবুর নাট্যজীবনে কী নতুন পর্ব শুরু হয়েছিল? কতদিনের সেই পর্ব? নাট্যচর্চায় তিনি কোন রাজনীতিই বা গ্রহণ করেছিলেন? 'মিছিল' নাটকে কী এমন বৈপ্লবিক রাজনীতির কথা আছে? 'মিছিল'-এ যেটা আছে, যৌবনের একটা উচ্ছ্বাস আছে, একজন বৃদ্ধ তরুণদের বলছেন;তোমরা লড়ে যাও আমি পিছনে আছি। এই পৃষ্ঠপোষকতা;এটা খুব বৈপ্লবিক জিনিস হল? কী এমন বৈপ্লবিক নকশাল রাজনীতির প্রসঙ্গ 'ভোমা'য় আছে? নকশালবাদ কোথায় আছে? রাঙাবেলিয়ায় বাদলবাবু যেটা দেখিয়েছেন সেটার একটা অসামান্য ডকুমেন্টেশন আছে, টোটাল ডকুমেন্টেশন আছে। তাতে নকশাল আন্দোলনের কী আছে? আমি মনে করি না নকশাল রাজনীতির কোনো প্রভাব বাদলবাবুর নাট্যকর্মে আছে।৭

এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই শমীক বন্দোপাধ্যায় বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের তত্ত্ব-নির্মাণ এবং থিয়েটারকে নিয়ে গ্রামে পৌছে যাওয়ার পিছনে একটি ভিন্নতর প্রেষণার কথা বলেছেন। সেটি হল বাদলবাবুর প্রিয় বিষয়;টাউন প্ল্যানিং-এর সূত্র ধরে আসা গ্রাম-পুনর্গঠন প্রকল্পের স্বপ্ন। টাউন প্ল্যানিং-এর মতো একটা বিষয়কে শুধু নগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রাম-সমাজের মধ্যে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটি তাঁর চিন্তায় ছিল। সি.এ.ডি.সি-র একজন কর্তা ঘনিষ্ঠ-বন্ধু অজিত নারায়ণ বসু-র চেষ্টায় ১৯৭৪-এ বাদলবাবুর 'ডাইরেকটর অভ প্ল্যানিং' হিসেবে পার্ট টাইম চুক্তিতে নিযুক্ত হন;গ্রামের কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যই। এবং তখনই সুন্দরবন অঞ্চলে রাঙাবেলিয়ার মতো গ্রামকে ঘিরে গ্রাম-পুনর্নির্মাণের কাজ করার ভাবনা তাঁকে পেয়ে বসে। ফলে 'ভোমা'-নির্মাণের জন্য যে রাঙাবেলিয়াকে বেছে নিচ্ছেন;সেটা নকশালবাড়ি রাজনীতির গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা-র শ্লোগান থেকে আসেনি, এসেছে ওই গ্রাম-পুনর্গঠনের ইচ্ছেজাত সোশ্যিও -পোলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস থেকে।৮

তৃতীয় রীতির থিয়েটার-আন্দোলন যেহেতু একটা সামূহিক আন্দোলন, সেখানে শতাব্দী ছাড়াও আরও অনেকগুলি দল;যাঁরা ওই নন-প্রসেনিয়াম নাট্যচর্চায় বিশ্বাস করেন, যাঁরা সোশ্যিও-পোলিটিক্যাল দায়বদ্ধতার বিচারে একই দর্শনে বিশ্বাসী, যাঁদের কর্ম-পদ্ধতিও সমপর্যায়ের;তাই এক্ষেত্রে বাদলবাবুর পাশাপাশি তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন কী ছিল, বা আদৌ ছিল কি না;সেটাও বুঝে নেওয়া দরকার। 'ঋতম্' নাট্যপত্রের প্রতিটি সংখ্যা যদি খুঁটিয়ে দেখা হয়, বোঝা যাবে বাদলবাবুর আগেই পথে নেমে প্রতিবাদেব রাজনীতি গ্রহণ করেছিল সিল্যুয়েট থেকে শুরু করে শ্রীবিদূষক এবং বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কস্। এরপর ১৯৭৪-এ প্রবীর দত্তের মৃত্যুরঘটনা তাঁদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে আরও দৃঢ় করে। ফলে অঙ্গন ছেড়ে পথে নেমে আসে শতাব্দী এবং থিয়েটার লাইবর, মেঘমন্দ্র, মতিঝিল এনাগো, ঋতম্, লিভিং থিয়েটার, পথসেনা, হালিশহর, অঙ্গন থিয়েটার গ্রুপ;প্রভৃতি নন-প্রসেনিয়াম দলগুলি। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'অঙ্গনমঞ্চ রাজনৈতিক বিবেচনা' লিখেছিলেন, সেখানে তৃতীয় থিয়েটারের রাজনৈতিক ভূমিকার কথাটাই সব থেকে তীব্রতার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল। তৃতীয় রীতির থিয়েটার-আন্দোলনের এই সামূহিকতাকে যদি রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকে উদ্দেশ্যমূলক বলা হয়, নিশ্চয় তা ভুল বলা হবে না।

এই উদ্দেশ্য-র পিছনেও নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল? উত্তর হল;হ্যাঁ ছিল বই কি! ষাটের মাঝামাঝি সংঘটিত হচ্ছে পাক-ভারত যুদ্ধ, ছেষট্টিতে শুরু হচ্ছে ভিয়েতনাম যুদ্ধ;সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদী আন্দোলন। সাতষট্টিতে প্রথমবারের জন্য সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস। কমরেড অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে সেই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসছে যুক্তফ্রন্ট। সাতষট্টি থেকে বাহাত্তর; পশ্চিমবঙ্গে সাত-সাতবার ক্ষমতার হাতবদল ঘটবে। কখনও অজয় মুখার্জির যুক্তফ্রন্ট,

কখনও প্রফুল্ল সেনের জাতীয় কংগ্রেস মসনদে বসবে, আর তারই মাঝে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে তিন-তিন বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে, এবং ফলশ্রুতিতে অনিবার্যভাবে উঠে আসবে শুরু হয় নকশালবাড়ি আন্দোলন। ১৯৬৯-থেকে সেই নকশাল-নৈরাজ্য বাংলা সংস্কৃতিজগৎকেও সন্ত্রস্ত করে রাখবে। সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাট ক্রমশ শুনশান হয়ে যাবে। চোরাগোপ্তা খুন, হুমকি, হামলা--ইত্যাদি শুরু হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় দর্শক কমে যেতে থাকল। পেশাদার মঞ্চের ব্যাবসায়; ইকোনমিতে অনিবার্যভাবে তার প্রভাব পড়ল। একাত্তর-বাহাত্তর জুড়ে নকশাল দমনের নামে ক্ষমতাসীন পার্টি ও প্রশাসনের সম্মিলিত নৃশংসতার যে ইতিহাস বাঙালি প্রত্যক্ষ করেছে, তার অনিবার্য প্রভাব তৃতীয় থিয়েটারের প্রতিটি দল, প্রতিটি নাট্যকর্মীর উপর পরোক্ষভাবে হলেও পড়তে বাধ্য। তাই থার্ড থিয়েটারের যে দর্শন;তার মধ্যে যেমন ছিল সোশ্যিও-পোলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস, গ্রাম-সমাজের প্রতি সামাজিক দায়দায়িত্বের বোধ, তেমনি ছিল শহুরে নাগরিক থিয়েটারের প্রতি একধরনের রিজেকশন। সেই রিজেকশন-কেও তো এক অর্থে রাজনৈতিকই বলা যায়।

বাদলবাবুর মৃত্যুর পর বিশাখা রায়ের বাজার গরম করা অভিযোগগুলির বস্তুত, কোনো ভিত্তিই নেই। কেন না বাদলবাবু যা করে গেছেন, যা বলে গেছেন;কোথাও কোনো লুকোছাপা নেই, তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। ১৯৭৮-এ তিনি 'দি থার্ড থিয়েটার' গ্রন্থে তৃতীয় থিয়েটারের যে 'তত্ত্ব' নির্মাণ করেছিলেন, সেটাই যে থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি;এমন অলৌকিক দাবি তিনি যেমন কোথাও কখনও করেননি, তেমনি এমন দাবিও কখনও করেননি যে এককভাবে তিনিই এই নাট্য-আন্দোলনের স্রষ্টা এবং সর্বস্ব। এমনকী 'বাসি খবর' নাটকটি যে শতাধী-র ওয়ার্কশপের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি সম্মিলিত কাজ, সেটির 'সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ, দৃষ্টিকোণ নির্ধারণ, মিলিত আলোচনায়, মিলিত চেষ্টায় হয়েছে' তা তো তিনি নাটকটির মুখবন্ধে লিখেইছেন। স্বীকার করেছেন;'অবশেষে সেই মিলিত চেষ্টার ফলটাকে আমি নাটকের আকারে লিখেছি।' তৃতীয় রীতির থিয়েটারে একটি নাট্য-প্রযোজনা নির্মাণের বিভিন্ন স্তরে যে গ্রহণ-বর্জনের পালা চলে, সেই গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়েই নাটকের টেক্সট প্রয়োজনমতো পরিবর্তিত হতে হতে আলটিমেটলি একটা 'প্রোডাকশন টেক্সট' হয়ে ওঠে। এটা শুধু বাদল সরকারের ক্ষেত্রেই নয়, তৃতীয় থিয়েটারের অন্য দলগুলির অধিনেতার ক্ষেত্রেও সত্য। তাঁর চারপাশে অথবা চোখের সামনে যা-কিছু ঘটেছে, ঘটে চলেছে;জনসংযোগের, কমিউনিকেশনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিট ইন্টারাকশন;সে-সমস্ত থেকেই স্রষ্টা ইনপুট নেন। স্রষ্টার ক্ষেত্রে 'মৌলিক' শব্দটাই বিতর্কিত এবং গোলমেলে। স্রষ্টার নিজের বলতে কিছু নেই, থাকতে পারে না। 'লাল রক্ত পুবের আকাশে' যেমন কারও মৌলিক সৃজন হতে পারে না, তেমনি 'জুঁই ফুলের মতো সাদা গরম ভাতের স্বপ্ন';এই মেটাফরও কখনও কারও 'মৌলিক' পঙ্‌ক্তি হয়ে উঠতেপারেনা। মৌলিকতার এই দাবি অনায্যশুধু নয়; হাস্যকরও।৯

// থার্ড থিয়েটারের পথিকৃত বাদল সরকার (১৫.০৭.১৯২৫ - ১৩.৫.২০১১)। এই বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ।//

তথ্যসূত্র-

১. বিশাখা রায়, 'থার্ড থিয়েটার অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ', থীমা ২০১৭। এছাড়া দেখুন, ব্রাত্য বসু গৃহীত বিশাখা রায়ের সাক্ষাৎকার-এর জন্য পড়ুন 'ব্রাত্যজন নাট্যপত্র', অষ্টাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৫

২. বাদল সরকার, 'নাট্যবিষয়ক বক্তব্য', সূত্র 'ঋতম্ ভিন্নপ্রথার থিয়েটারের মুখপত্র' সংকলনও সম্পাদনা আশিস গোস্বামী, মৌহারি, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৯৮

৩. বাদল সরকার, 'থিয়েটারের ভাষা', সূত্র 'নাট্যচিন্তা থার্ড থিয়েটার', সম্পাদনা ও ভূমিকা শুভেন্দু সরকার, পৃ. ৬৬

৪. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাক্ষাৎকার বাদল সরকারের সঙ্গে', 'অঙ্গন' শতী ২৫ বছর বিশেষ সংখ্যা, সূত্র 'অন্য রীতির নাট্যপত্র অঙ্গন', সম্পাদনা দেবাশিস চক্রবর্তী, বাদল সরকার নাট্যচর্চা কেন্দ্র, মীরা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৪৪৩

৫. ওই, পৃ. ৪৪৪

৬. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার', থীমা ২০১৭, পৃ. ১৬

৭. 'বাদলবাবুর থিয়েটারের কোনো ইমপ্যাক্ট আজ আর নেই', শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার গ্রহণ মলয় রক্ষিত), 'কৃত্তিবাস' বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা;লেজেন্ড, ১৬ জুলাই ২০২৫, পৃ. ২৭

৮. 'কৃত্তিবাস' বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা;লেজেন্ড, ১৬ জুলাই ২০২৫, পৃ. ২৭-২৮। এছাড়া সাহায্য নিয়েছি শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেওয়া বাদল সরকারের প্রথম সাক্ষাৎকারটির। সূত্র 'বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার', থীমা ২০১৭, পৃ. ৭১-৭৩

৯. বিশাখা রায়ের বিশদ বক্তব্যের জন্য দেখুন তাঁর লেখা 'থার্ড থিয়েটার অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ' থীমা-২০১৭ গ্রন্থটি। এছাড়া ব্রাত্য বসু গৃহীত বিশাখা রায়ের সাক্ষাৎকার-এর জন্য পড়ুন 'ব্রাত্যজন নাট্যপত্র', অষ্টাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৫

বিজ্ঞান

# ইয়েল্লাপ্রগড়া সুব্বারাও

মানস কুমার লাহা

আপনি হয়তো কখনো ইয়েল্লাপ্রগড়া সুব্বারাওয়ের নাম শোনেননি। যেমন শোনেননি এই দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষই। অথচ, তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে যে, 'তিনি ছিলেন বলে হয়তো আপনি আজ সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। তিনি ছিলেন বলেই হয়তো আপনি বেশিদিন বাঁচতে পারেন।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেডার্লে কোম্পানির গবেষণা নিদেশক হিসেবে উনিশশো চল্লিশের দশকে সুব্বারাও বৈজ্ঞানিকদের যে দলটির পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বেশ কিছু প্রাণঘাতী রোগের প্রতিকার তাঁরা আবিষ্কার করেন। ফলিক অ্যাসিড বা ভিটামিন বি৯, যা মানবদেহের বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপরিহার্য, তাঁরাই প্রথম কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করেন; তাঁরা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রথম, এবং এখনও ব্যবহৃত, কেমোথেরাপির ওষুধ অ্যামিনোপ্টেরিন আবিষ্কার করেন; ফাইলেরিয়ার ওষুধ ডাইইথাইলকার্বামাজিন, যা সাধারণত হেট্রাজেন নামে বাজারে পাওয়া যায়, আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরাই; এবং প্রথম ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন (অরিওমাইসিন) আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাঁদেরই। এর আগে, উনিশশো কুড়ির দশকে হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে পিএইচ.ডি. করার সময় মানবদেহের কলায় ফসফরাসের পরিমাণ নিরূপণ করার একটি পদ্ধতি সুব্বারাও ও তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক সাইরাস ফিস্কে আবিষ্কার করেছিলেন যা এখনও প্রচলিত। পরে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে তাঁরা অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট নামক একটি যৌগ শনাক্ত করেন, যা মানবদেহে শক্তি পরিবহনের জন্য অপরিহার্য। আর উনিশশো আটচল্লিশ সালে, ৫৩ বছর বয়সে, সুব্বারাও ঘুমের মধ্যে হঠাৎ মারা যান।

**সুব্বারাওয়ের কর্মকাণ্ড**

হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে সুব্বারাও ও তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক সাইরাস ফিস্কে মানবদেহের কলায় উপস্থিত ফসফরাসের পরিমাণ নির্ধারণে উনীশশো পঁচিশ সালে যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তা ফিস্কে-সুব্বারাও পদ্ধতি নামে পরিচিত। পদ্ধতিটি এখনও ব্যবহার হয় এবং আজ পর্যন্ত কম করে ২৭,০০০ বার বিভিন্ন গবেষণা পত্রে এটি উল্লেখিত হয়েছে । এই পদ্ধতি এবং পরীক্ষামূলক জৈব রসায়নে সুব্বারাওয়ের প্রভূত দক্ষতার সাহায্যে তিনি ও ফিস্কে (এবং স্বাধীনভাবে জার্মানিতে কার্ল লোহম্যান) উনিশশো উনত্রিশ সালে ফসফোক্রিয়েটিন আবিষ্কার করেন, যা পেশী এবং মস্তিষ্কের কলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া তাঁরা অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (এ.টি.পি.) নামক যৌগ আবিষ্কার করেন, যাকে জীববিজ্ঞানীরা ক্ষুদ্রজীবনের শক্তি মুদ্রাক্ষ্ম বলে থাকেন, কারণ এই যৌগটি বিভিন্ন কোষীয় প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। এ.টি.পি. এবং ফসফোক্রিয়েটিনের উপর ফিস্কে ও সুব্বারাওয়ের গবেষণা আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে পেশী সংকোচনের সময়ে কোষগুলি কীভাবে শক্তি উৎপন্ন করে এবং ব্যবহার করে।

মারাত্মকভাবে অপুষ্টিতে ভোগার দরুন কিছু ধরনের রক্তাল্পতা, যেমন গর্ভাবস্থার ম্যাক্রোসাইটিক রক্তাল্পতা এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় স্প্রু সম্পর্কিত রক্তাল্পতা প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য ফলিক অ্যাসিড অপরিহার্য। এটি ডি.এন.এ. গঠনে এবং কোষ বিভাজনে সাহায্য করে, যার ফলে মানবদেহের বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ হয়। টাটা ট্রাস্টের অনুদানে বোম্বের (অধুনা মুম্বাই) হ্যাফকাইন ইনস্টিটিউটে লুসি উইলসের পূর্ববর্তী কাজের উপর ভিত্তি করে ১৯৪১ সালে এইচ কে মিচেল এবং অন্যান্যরা এটি প্রথম পালং শাক থেকে নিষ্কাশন করেছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে নিউ ইয়র্কের লেডার্লে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা নিদেশক হিসেবে নিয়োজিত সুব্বারাও যে গবেষণা দলের নেতৃত্ব দেন তার এক সদস্য বব স্টোকস্ট্যাড ১৯৪৩ সালে বিশুদ্ধ স্ফটিকাকার ফলিক অ্যাসিড বা ভিটামিন বি৯ সংশ্লেষিত করতে সফল হ'ন।

তাঁর পুরনো বন্ধু এবং কিংবদন্তি শিশু ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, ডাঃ সিডনি ফার্বারের উৎসাহে সুব্বারাও এবং তাঁর দল (বিশেষ করে বি.এল. হাচিংস) উনিশশো সাতচল্লিশ সালে অ্যামিনোপ্টেরিন তৈরি করেন, যা ফলিক অ্যাসিডের ক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং ক্যান্সার কোষের বিভাজন ও দ্রুত বৃদ্ধি রোধ করে। অ্যামিনোপ্টেরিন হ'ল ক্যান্সারের জন্য প্রথম সফল কেমোথেরাপির ওষুধ। অ্যামিনোপ্টেরিন সরাসরি নয়, তার তুতো ভাই মেথোট্রেক্সেট আজও ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্যান্সার ছাড়াও সোরিয়াসিস, সন্ধিবাত ও অন্যান্য কিছু রোগের চিকিৎসায়ও এটি আজকাল ব্যবহার করা হয়।

টেট্রাসাইক্লিন অ্যান্টিবায়োটিকগুলির মধ্যে প্রথম আবিষ্কৃত হয় ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন (অরিওমাইসিন)। তখনকার দিনের বৃহত্তম বন্টিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল ছিল এই আবিষ্কার! ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রাপ্ত হওয়াতে জীববিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন যে ছত্রাক থেকে আমরা আরও অ্যান্টিবায়োটিক পেতে পারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাড়ি ফিরে আসা মার্কিন সৈন্যদের প্রত্যেককে সেখানকার এক মুঠো মাটি আনতে বলা হয়েছিল। মার্কিন দেশের অনেক জায়গা থেকেও মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর থেকে অনেকগুলি লেডার্লের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। সেখানে, সুব্বারাওয়ের নির্দেশনায় ডঃ বেঞ্জামিন ডুগার - যিনি উদ্ভিদবিদ্যাবিদ হিসাবে তাঁর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর, ৭০ বছর বয়সে সুব্বারাওয়ের দলে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালে ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন (অরিওমাইসিন) নিষ্কাশনে সক্ষম হ'ন। এটি ছিল প্রথম 'ব্রড স্পেকট্রাম' অ্যান্টিবায়োটিক, যা অনেক রকমের জীবাণুকে ঘায়েল করতে পারে। কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সে ক্ষমতা ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী নানান যুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনী গ্রীষ্মমন্ডলীয় রোগের দ্বারা আক্রান্ত মার্কিন সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ওষুধের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। ম্যালেরিয়া এবং ফাইলেরিয়াসিসের নিরাময়ের জন্য তাঁর পরীক্ষাগারে সুব্বারাও একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেন এবং দলের সদস্য রেজিনাল্ড হিউইটকে শত শত সম্ভাব্য রাসায়নিক সরবরাহ করেন। এর মধ্যে একটি থেকে হিউইট ফাইলেরিয়াসিসের নিরাময় হিসাবে ডাইইথাইলকারবামাজিন পান। এই ওষুধটি বাজারে আজও হেট্রাজেন নামে বহুল প্রচলিত।

**মানুষ সুব্বারাও**

ইয়েল্লাপ্রগড়া সুব্বারাও ১৮৯৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের ভীমাবরমে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি অনেক কষ্টের সম্মুখীন হন। নিম্ন পদের সরকারি কর্মচারী তাঁর বাবাকে অসুস্থতার কারণে অকালে অবসর নিতে হয়। তাঁদের পরিবারে নেমে আসে কঠিন দারিদ্র্য। তাঁর দুই ভাই ও তিনি নিজে অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন। এই সব কারণে তিনি তিনবারের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

স্কুল শিক্ষা শেষ করার পরপরই সুব্বারাও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মায়ের অনুমতি পেতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর আর মিশনে যোগ দেওয়া হয়নি। তখন মিশনের কর্মকর্তারা তাঁকে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য উৎসাহিত করেন এবং বলেন যে চিকিৎসক হয়ে তিনি মিশনে ডাক্তার হিসেবে যোগদান করতে পারেন।

সুব্বারাও সেই অনুযায়ী মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন, যেখানে তাঁর পড়াশোনার পৃষ্ঠপোষকতা করেন কিছু বন্ধু এবং পরিচিতরা, বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠ কস্তুরী সূর্যনারায়ণ মূর্তি মহাশয়। সুব্বারাওয়ের জাতীয়তাবাদী প্রবণতা এবং খদ্দরের প্রতি ঝোঁক (হাসপাতালে তিনি খদ্দরের গাউন পরে যেতেন!) সার্জারির ব্রিটিশ অধ্যাপককে কুপিত করে। ফলতঃ সেই অধ্যাপক সুব্বারাওকে এই বিষয়ে অকৃতকার্য করে দেন, যার ফলে তাঁকে স্নাতকের চেয়ে নিকৃষ্টতর লাইসেন্সিয়েটের যোগ্যতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রসঙ্গত, কিংবদন্তি চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রায় একই কারণে একই পরিণতির শিকার হ'ন।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করার পর সুব্বারাও রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে যুক্ত না হয়ে সরকারি চাকরি খুঁজতে শুরু করেন। এর সম্ভাব্য কারণ ততদিনে সূর্যনারায়ণ মূর্তির কন্যা শেষগিরির সাথে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। স্নাতক ডিগ্রি না থাকায় মাদ্রাজ মেডিক্যাল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারেন না সুব্বারাও। তিনি মাদ্রাজের একটি আয়ুর্বেদ কলেজে অ্যানাটমি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এই সময়েই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণার প্রতি আগ্রহী হতে শুরু করেন।

রকফেলার ফাউন্ডেশনের বক্রকৃমি বিরোধী প্রচারণায় ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ডঃ কেনরিক সেই সময় মাদ্রাজে এসেছিলেন। ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে সুব্বারাওয়ের সাক্ষাৎ হয় ও তিনি সুব্বারাওকে বোস্টনের হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তির আবেদন করতে অনুপ্রাণিত করেন। সুব্বারাও সেইমত আবেদন করেন ও উনিশশো একুশ সালে তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর হয়। কিন্তু অপুষ্টির কারণে সৃষ্ট গ্রীষ্মমন্ডলীয় স্প্রু রোগে তাঁর দুই দাদার অকালমৃত্যু হওয়ায় তিনি সেবছর যেতে পারেননি। তবে হতোদ্যম না হয়ে সুব্বারাও পুনরায় চেষ্টা করেন। অবশেষে উনিশশো তেইশ সালে তিনি সেখানে পৌঁছন। সূর্যনারায়ণ মূর্তি, যিনি তখন বিবাহসূত্রে তাঁর শ্বশুর, সুব্বারাওয়ের মার্কিন দেশে যাওয়ার খরচ বহন করেছিলেন। এছাড়া কাকিনাড়ার মল্লাডি সত্যলিঙ্গম নাইকার দাতব্য সংস্থা

হার্ভার্ডে শিক্ষার খরচ বাবদ বার্ষিক ১,৫০০ টাকার বৃত্তি (তখনকার বিনিময় মূল্যে কমবেশি ৫০০ মার্কিন ডলার) তিন বছরের জন্য দিয়েছিল।

বোস্টনে অর্থের অভাবে সুব্বারাও অনেক কষ্টের সম্মুখীন হ'ন। যেহেতু তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক ছিলেন না তাই হার্ভার্ডে তিনি কোন ইন্টার্নশিপ বা ফেলোশিপ পাননি। নিজের ভরণপোষণ এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ক্লাসের পরেও কিছু ছোটখাটো কাজ করতেন, যার মধ্যে ছিল রোগীদের বেডপ্যান ও শৌচাগার পরিষ্কার করা। এই সময়েই ডঃ সিডনি ফার্বারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হয়। উনিশশো চব্বিশ সালে ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা অর্জনের পর সুব্বারাও সাইরাস ফিস্কের তত্ত্বাবধানে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে যোগদান করেন। এক বছরের মধ্যেই তিনি মানব শরীরের কলায় ফসফরাস পরিমাপ করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা ফিস্কে-রাও পদ্ধতি নামে খ্যাত। উনিশশো পঁচিশ সালে জার্নাল অফ বায়োলজিক্যাল কেমিস্ট্রি -তে এই কাজের বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি লাভ করেন এবং জৈব রসায়নের পাঠ্যপুস্তকে তাঁর কাজ ও নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। ফিস্কে-রাও পদ্ধতির মৌলিক গুরুত্ব এবং প্রায় চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা অনুমান করা যায় যখন দেখি দু'হাজার পঁচিশ সালের জুন মাস পর্যন্ত এটি ২৭,০০০ এরও বেশি বার বিভিন্ন গবেষণাপত্রে উল্লেখিত হয়েছে! পরবর্তীকালে তিনি এবং ফিস্কে যথাক্রমে উনিশশো সাতাশ এবং উনিশশো উনত্রিশ সালে ফসফোক্রিয়েটিন এবং এ.টি.পি. শনাক্ত করেন এবং মানব দেহে এদের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন।

উনিশশো ত্রিশ সালে সুব্বারাও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি একজন 'শিক্ষক সহকর্মী' নিযুক্ত হন। এটি এমন একটি পদ যা তাঁকে স্বাধীন গবেষণা করার অধিকার দিয়েছিল কিন্তু ডক্টরেট শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান করার, গবেষণার জন্য স্বাধীন তহবিল পাওয়ার বা স্বাধীনভাবে নিজের কাজ প্রকাশ করার অনুমতি দেয়নি। তাই, জৈব রসায়নে উদ্ভাবনী কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময়ও তিনি আইনত ফিস্কের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বহু বছর পরে, উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে, ফিস্কের আরেক ছাত্র জর্জ হিচিংস, (যিনি পরে, উনিশশো অষ্টআশি সালে, চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পান), মন্তব্য করেন যে সুব্বারাওয়ের প্রাপ্ত অনেক যৌগ বহু বছর পরে অন্যদের দ্বারা পুনরায় আবিষ্কার হয়েছিল কারণ ফিস্কে সুব্বারাওকে তাঁর গবেষণা প্রকাশ করতে দেননি!

এটি ছিল ভাগ্যের চরম পরিহাস, কারণ উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে যখন ফিস্কের পদোন্নতির কথা হচ্ছিল, তখন, ফিস্কের সাহায্য হবে ভেবে সুব্বারাও ঘোষণা করেছিলেন যে ফিস্কেই এ.টি.পি.র চরিত্রায়নের সমস্ত কাজ করেছেন, এবং তিনি নিজে সহকারী মাত্র ছিলেন যা ছিল বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুব্বারাওয়ের এহেন আত্মবলিদানে ফিস্কে কিন্তু পদোন্নতি পেলেন না; এবং সুব্বারাওকে অনুষদের পদ থেকে বঞ্চিত করা হ'ল কারণ তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে তিনি কোনও মৌলিক কাজ করেননি! এই ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধার্থ মুখার্জি তাঁর দি এম্পেরর অফ অল ম্যালাডিজ বইতে মন্তব্য করেছেন যে 'এই কৃতিত্বগুলির মধ্যে যেকোনও একটি তাঁর পক্ষে হার্ভার্ডে অধ্যাপক পদ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সুব্বারাও ছিলেন বিদেশী, মুখচোরা, নিশাচর, অদ্ভুত উচ্চারণে কথা বলা নিরামিষভোজী এক জীব যিনি শহরের অফিস পাড়ায় এক কামরার একটি বাসস্থানে থাকতেন। কেবল সিডনি ফার্বারের মতো অন্যান্য নিশাচরদের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব ছিল'। এই সমস্ত ঘটনায় তিনি নিশ্চয়ই আহত হয়েছিলেন, কিন্তু সুব্বারাও লিভার, অগ্ন্যাশয় এবং কিডনির মতো অঙ্গ থেকে ভিটামিন ও অন্যান্য মূল্যবান যৌগ নিষ্কাশন এবং পেনিসিলিন তৈরির পদ্ধতি উন্নত করার কাজ চালিয়ে যান। প্রসঙ্গত, পেনিসিলিন তখন পর্যন্ত একমাত্র অ্যান্টিবায়োটিক ছিল। এই কাজের মাধ্যমে তিনি নিউ ইয়র্কের লেডার্লে পরীক্ষাগারে গবেষকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আমেরিকান সায়ানামিডের একটি বিভাগ ছিল লেডার্লে, সেই সময়কার একটি শীর্ষস্থানীয় ওষুধ গবেষণা এবং উৎপাদন পরীক্ষাগার।

১৯৪০ সালে লেডার্লে পরীক্ষাগার সুব্বারাওকে গবেষণার সহকারী নিদেশকের পদে আহ্বান করে, এবং গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি সানন্দে সে সুযোগ গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি বৈজ্ঞানিকদের একটি দল তৈরি করেন যার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন নবীন গবেষক। এই দলের কিছু সদস্যকে সুব্বারাও ফলিক অ্যাসিড পৃথকীকরণ এবং সংশ্লেষণে অনুপ্রাণিত করেন। এই প্রচেষ্টার প্রথম ফল আসে উনিশশো তেতাল্লিশ সালে, যখন বব স্টোকস্ট্যাড স্ফটিক আকারে ফলিক অ্যাসিড প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। এর পর গবেষণা নিদেশক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে সুব্বারাও ও তাঁর দল এই লেখার প্রারম্ভে বর্ণিত যুগান্তকারী কাজ চালিয়ে যান।

যখন সুব্বারাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান,

তখন চিকিৎসার মতো কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া অ-শ্বেতাঙ্গদের প্রবেশের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার শুরু থেকেই তিনি ভয় পেতেন যে আইনের সামান্য লঙ্ঘনের জন্য তাঁকে আটক করা হবে এবং তারপর ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সম্ভবত এই ভয়ের কারণেই তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন যে মানুষকে, বিশেষ করে যাদের সদিচ্ছার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর থাকা ও কাজ করা নির্ভর করবে তাদেরকে, চটাবেন না। ফিস্কে ঘটনাটি এরই ফল হতে পারে। এমনকি লেডার্লে পরীক্ষাগারেও তিনি অত্যন্ত আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন। প্রায়ই গবেষণাপত্রের লেখকদের নামের ক্রমে শেষ লেখক হিসাবে নিজের নাম উল্লেখ করতেন, কখনো বা তাও করতেন না, এমনকি গবেষণাপত্রে বর্ণিত কাজে তিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকলেও না। তাঁর এই নীতিই বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক জগতে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর পরিচয়হীনতার জন্য মূলত দায়ী ছিল। অবশ্য তিনি তাঁর নিজস্ব মহলে, অর্থাৎ নতুন ওষুধ প্রস্তুতকারী গবেষণাগার ও সেই ওষুধগুলি প্রয়োগ করে দেখা হ'ত যে সব হাসপাতালগুলিতে সেখানে, সুপরিচিত ছিলেন।

তবে সুব্বারওয়ের সব কাজই প্রশংসনীয় ছিল না। তিনি আর কখনও ভারতে ফিরে যাননি (হয়তো এই ভয়ে যে তাঁকে আর মার্কিন দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।) সে কারণে তাঁর যুবতী স্ত্রী শেষগিরি, যাঁকে তিনি উনিশশো তেইশ সালে গর্ভবতী রেখে মার্কিন দেশে চলে গিয়েছিলেন, তাঁকে কার্যত ত্যাগ করেন। শেষগিরির গর্ভে জন্ম নেওয়া তাঁদের পুত্র এক বছর পূর্ণ করার আগেই মারা যায়। প্রথম প্রথম তাঁর স্ত্রীকে তিনি লিখেছিলেন, 'প্রতিটি চিঠিতে জিজ্ঞাসা করা ভালো নয় যে আমি কবে ফিরে আসব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আসব।' তারপর উনিশশো ত্রিশের দশকের গোড়ার দিক থেকে বাড়িতে চিঠি লেখা বন্ধই করে দেন। তবে সুব্বারাও তাঁর শ্বশুরের থেকে নেওয়া সব ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। মার্কিন দেশে তাঁর পরিচিতদের দৃষ্টিতে সুব্বারাও ছিলেন একজন খরখরে ও চিড়বিড়ে মানুষ, অন্তরঙ্গ মানবিক সম্পর্কের প্রতি যাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। কাজই তাঁর জীবনকে মধুময় করেছিল।

নবযৌবনের আদর্শ, দেশপ্রেম, স্ত্রী পুত্র সব ছেড়ে সুব্বারাওয়ের বিদেশে পাকাপাকিভাবে চলে যাওয়াকে অনেকেই মেনে নিতে পারেন না ও তাঁকে স্বার্থপর বলে মনে করেন। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হয়তো এরকম ভাবাটা ঠিকই। কিন্তু ওঁর স্বপক্ষে এটা বলা যায় যে যবে থেকে গবেষণার ইচ্ছা তাঁর ওপর চেপে বসেছিল সেই থেকে তিনি সাধারণ মানুষের বদলে একজন অত্যন্ত সৃষ্টিশীল মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, যিনি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে বিভোর হয়ে থাকতেন। তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি অনেক কষ্ট ও বঞ্চনা স্বীকার করেছেন। তাঁর গবেষণার ফল যা তিনি মানব সমাজকে দিয়ে গেছেন তাতে সত্যিই বলা যায় যে তাঁর দানে আমরা প্রত্যেকে হয়তো আরেকটু সুস্থ থেকে আরও কিছুদিন বেশি বাঁচতে পারি।

উনিশশো আটচল্লিশ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনে অরিয়োমাইসিন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। আর ৮ই আগস্ট ঘুমের মধ্যেই সুব্বারাও হঠাৎ মারা যান! তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি একাই থাকতেন এবং অতিরিক্ত ধূমপান করতেন, যা হয়তো তাঁর অকালমৃত্যুর আনুষঙ্গিক কারণ ছিল। সুব্বারাও যখন তাদের সংস্থায় কর্মরত ছিলেন, তখন হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল বা লেডার্লে পরীক্ষাগার কেউই তাঁকে অর্থ বা খ্যাতির দিক থেকে খুব বেশি কিছু দেয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর লেডার্লে পরীক্ষাগার এ ব্যাপারে তাদের অবহেলা কিছুটা সংশোধন করার চেষ্টা করেছিল। তারা তাদের ক্যাম্পাসের একটি ভবনের নামকরণ তাঁর নামে করেছিল; একটি ছত্রাকের নামকরণ করা হয়েছিল সুবারোমাইসিস সেপ্লান্ডেন্স; এবং এক ধরণের টেট্রাসাইক্লিন ওষুধের বাজার চলতি নাম দেওয়া হয়েছিল সুবামাইসিন। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন তাঁকে বিংশ শতাধীর অন্যতম বিশিষ্ট চিকিৎসা মনীষী হিসেবে অভিহিত করে। উনিশশো পঁচানব্বই সালে ভারতের কিছু চিকিৎসা মহলে তাঁর শতবর্ষ উদযাপন করা হয় এবং ভারত সরকার তাঁর সম্মানে একটি স্মারক ডাকটিকিট জারি করে। তবে সামগ্রিকভাবে ইয়েল্লাপ্রগড়া সুব্বারাওয়ের অবদান জনসাধারণের অগোচরেই থেকে গিয়েছে। ❐

ঋণ স্বীকার -

http//en.wikipedia.org/wiki/Yellapragada_SubbaRow History of Medicine Dr.Yellapragada SubbaRow S1895-1948V - He Transformed Science— Changed Lives. Pushpa Mitra Bhargava– J. Indian Acad. Clinical Medicine 2 S1–2V 96éôé100– 2001.

htt//www.hektoeninternational.org/index.phpÚoption=com_content&view=article&id=770%3ASubbaRowprofilescientificgreatness&catid=62&Itemid=435

ইতিহাসের দর্পণে

# কাশ্মীরের পন্ডিত সমাজের নিষ্ক্রমণ সম্পর্কে কিছু কথা

শুভ বসু

কাশ্মীরের বিষয়ে লেখার সময় বহু অজানা এবং অচেনা বন্ধু আমার দেয়ালে মন্তব্য করেছিলেন পন্ডিতদের হাল দেখুন । দীর্ঘদিন ইতিহাস চর্চার পর মনে হলো এই প্রশ্নের একটি যথাযথ আলোচনা প্রয়োজন। জম্মু কাশ্মীরে ভারতীয় উপমহাদেশের আর পাঁচটি অঞ্চলের মতো বহু ভাষিক বহু ধর্মের মানুষের বসবাস। মূলত কাশ্মীর উপত্যকাতে মুসলিম প্রাধান্য, জম্মুতে হিন্দু প্রাধান্য এবং লাদাখের কার্গিল অঞ্চলে শিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের প্রাধান্য এবং উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের উপস্থিতি লে অঞ্চলে। কিন্তু এর মধ্যেই ভাষা, ধর্ম এবং নানাবিধ জাতীয়বাদ; এর কুস্তি বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের মধ্যে সম্পর্কে চির ধরিয়েছে। সেই নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন আছে। যদিও সেই প্রশ্ন উপস্থাপনার ভঙ্গিটা অদ্ভুত । কারো মতে 'ওরা' যদি হিন্দু পন্ডিতদের বিতারণ করতে পারেন তাহলে 'আমরাই' বা কেন স্বাধিকার হরণ করতে পারবো না । এই ওরা আর আমরা কারা তা নিশ্চয় ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বলে দিতে হবে না। কারো মতে হিন্দুদের বিতারণ নিয়ে কেউ কেন কথা বলেন না। অন্য দিকে এটাও সত্যি যে গত দুই দশক ধরে ভারত সরকার কাশ্মীরিদের বিষয়ে পন্ডিতদের দুরবস্থার কথা প্রচুর বলেছেন কিন্তু কাশ্মীরের পন্ডিতদের পুনর্বাসনের কোনো উল্লেখ্যযোগ্য উদ্যোগ ভারত সরকার গ্রহণ করেন নি। আর পাকিস্তানের সরকার এবং বিভিন্ন ইসলামিক উগ্রবাদী সংগঠন তো বলেছেন বেশ করা হয়েছে তাড়ানো হয়েছে। এবং আর.এস.এস ও তার শাখা গুলির কথা শুনে মনে হয় কাশ্মীরে শুধু পন্ডিতদের অনুপস্থিতি একমাত্র সমস্যা। এবং তার বহু

কাশ্মীরে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনের পূর্বে, একটি বর্ণবাদী সমাজ ছিল। যার উপরে ছিলেন ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা যারা নিম্ন বর্ণের হিন্দু চাষি এবং কারিগরদের উপরে প্রভুত্ব করতেন। প্রাচীন নিলামতা পুরাণ এ উল্লেখ আছে যে হিন্দু রাজা নীলাঙ্গ যে আইন চালু করেছিলেন তাতে ব্রাহ্মণদের একই অপরাধে গরিব নিম্ন বর্ণের মানুষদের চাইতে সাজা অনেক কম হতো।

অতিরঞ্জিত বিবরণ তারা পেশ করেই থাকেন। কিন্তু পন্ডিতদের কাশ্মীর থেকে ১৯৮৯-১৯৯০ সালে নিষ্ক্রমণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তা দীর্ঘকালীন কাশ্মীরের স্বাধিকার নিয়ে নানা রাজনীতির ফলশ্রুতি সে কথা স্মরণ করানো কর্তব্য বলে মনে করি। আর কাশ্মীর সমস্যার বিবর্তন দক্ষিণ এশিয়ার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত। আমি তাই এখানে কাশ্মীরের সমাজের একটি ঐতিহাসিক চিত্র রেখা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছি। হয়তো এনিয়ে তীব্র রাজনৈতিক সমালোচনার সম্মুখীন হবো কিন্তু এটি জরুরি বলে মনে করি। বিতর্ক গণতন্ত্রের অংশ। আর অধ্যাপক অর্মত্য সেন তো তার গ্রন্থের নামই দিয়েছেন তার্কিক ভারতীয়।

## কাশ্মীরীয়াত ও তার ইতিহাস।

কাশ্মীরে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনের পূর্বে, একটি বর্ণবাদী সমাজ ছিল। যার উপরে ছিলেন ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা যারা নিম্ন বর্ণের হিন্দু চাষি এবং কারিগরদের উপরে প্রভুত্ব করতেন। প্রাচীন নিলামতা পুরাণ এ উল্লেখ আছে যে হিন্দু রাজা নীলাঙ্গ যে আইন চালু করেছিলেন তাতে ব্রাহ্মণদের একই অপরাধে গরিব নিম্ন বর্ণের মানুষদের চাইতে সাজা অনেক কম হতো। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদ হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ঘটে। বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পছন্দ ছিল না। জয়রথ বলে এক পন্ডিতের ভাষ্য 'হারাচারিতাচিন্তামনি' অনুযায়ী বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে বলিদান এবং নানাধরণের প্রথা কাশ্মীরে বিলুপ্ত হয় । রাজা নীলাঙ্গ বুদ্ধকে দানব বলে অভিহিত করেন এবং সরাভক্তমনাঃ বুদ্ধ কে জগৎ সংসারের ধ্বংসকারী বলেন। তবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমার পরে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য প্রথার বিরুদ্ধে শৈব ধর্মের উত্থান হয়। পুরোহিততন্ত্র তাতেও কাশ্মীরের সমাজে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রখ্যাত আদি মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাসে ঐতিহাসিক কলহন 'রাজতরঙ্গিণী' তে প্রতিবাদী শৈবদের হিন্দুদের প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলে উল্লেখ করেন।

প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন কাশেমের সৈন্যরা যখন সিন্ধু রাজা দাহির কে পরাজিত করেন তখন দাহিরের সন্তান

জয়সিয়া কাশ্মীরে পলায়ন করেন আর তার সঙ্গ দেন হামিম বিন সামা বলে তার এক সিরিয়ান সেনানী। কাশ্মীরের হিন্দু রাজা তাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাকে জমি দেন যাতে তিনি মসজিদ স্থাপন করেন। তিনি কাশ্মীরের সর্বপ্রথম মুসলমান। এ ছাড়া নবম শতাধী তে কাশ্মীরের এক অজানা 'হিন্দু' রাজা আমির 'আধুল্লাহ বিন ' উমার বিন 'আধুল 'আজিজ মানসুরা কে, অনুরোধ করেন একজন পন্ডিত ব্যক্তি পাঠাতে যিনি ইসলামিক শরিয়া আল-হিন্দিয়া ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারেন।নবম শতাধীর হিন্দু রাজা মেহরোক পবিত্র কোরানের অনুবাদের জন্যে এক পন্ডিত ব্যক্তির সন্ধান করেন(১০৮৯ ,১১০১ খ্রিস্টাব্দে)। বহু ম্লেচ্ছকে (একটি অবমাননাকর শব্দ) তার রাজ্ দরবারে নিয়োগ করেন। এখন ইতিহাস নিয়ে যে প্রচার হয় যে ভারতের আদি মধ্যযুগে হিন্দু মুসলমানের ইতিহাস সংঘাতময় তা একান্ত অনৈতিহাসিক ব্যাখ্যা।

কাশ্মীরে ইসলামের প্রচারে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন সায়েদ শারাফ উদ দিন আধুর রহমান সুহরাবর্দী । যিনি কাশ্মীরের জনগণের কাছে বুলবুল শাহ বলে পরিচিত ।তাঁরই প্রভাবেই কাশ্মীরের লাদাখের বৌদ্ধ বংশোভূত রাজা রিণচান শাহ (লহছান গুলবু রিণচান) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তার রাজত্ব কাল ১২৯০ থেকে ১৩২০ খ্রিস্টাধ। কথিত আছে রিণচান শাহ লাদাখের বৌদ্ধ হয়েও ব্রাহ্মণও ধর্মে দীক্ষিত হতে গিয়েছিলেন। সেই সময় কাশ্মীর উপত্যকাতে শৈব ধর্ম প্রচলিত ছিল। রিণচান শাহ শৈব প্রধান শ্রীদেবস্বামীকে তাকে সেই ধর্মে দীক্ষিত করার কথা বলেন। দেবস্বামী পন্ডিতদের পরামর্শ নিলে তারা বলেন একজন ভোট ( slang for Tibetan) কে তারা দীক্ষা দিতে পারবেন না। পরে সুফী সন্ত বুলবুল শাহ তাকে ইসলামে দীক্ষা দেন তবে এই গল্পটি অতি সরলীকৃত। খুব সম্ভবত রাজ্ দরবারে নানা চক্রান্ত, দলবাজি এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু সভাসদদের মধ্যে বৈরিতার জন্যে তিনি ধর্মান্তরিত হন। বর্তমান সামাজিক ঐতিহাসিকরা রাজার ধর্মান্তকরণ এর ফলে প্রজার ধর্মান্তকরণ হবে এটা বিশ্বাস করেন না।

তার পরে মীর সৈয়দ আলী হামাদানী (১৩১৪-১৩৮৪) ইসলামের প্রচার করেন কাশ্মীরে। তার জন্ম ছিল ইরানের হামদানে এবং মৃত্যু হয় তাজিকিস্তানে । তিনি কুবরাবীয়া সিলসিলার সুফী সন্ত ছিলেন। রিণচান শাহর কাহিনী জনরাজা লিখিত দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখিত আছে। সিকান্দর শাহ এর সময়ে তার প্রধান মন্ত্রী সুহা ভাট যিনি ব্রাহ্মণ থেকে মুসলমানে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তার অত্যাচারের কাহিনী বিধৃত আছে। অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের প্রভাবিত করেন পন্ডিত দের বিরুদ্ধে যেতে। পূর্ণি নামে একজন ক্ষৌর কর্মী নাকি সুলতান হায়দার শাহ কে প্রভাবিত করেছিলেন পন্ডিতদের উপর অত্যাচারে। তবে কাশ্মীরের ইতিহাসে পন্ডিতদের উপরে অত্যাচার হিন্দু রাজাদের সময়েও হয়েছে। জালাউকা এবং কালাসা নামে দুই হিন্দু রাজা এবং পরে রাজা হর্ষ (১০৮৯ -১১০১), মন্দিরের সঞ্চিত ধন রত্ন লুঠ করেন এবং বিগ্রহ গলিয়ে সোনা আর রুপোর মুদ্রা তৈরী করেন রাজকোষের আর্থিক সংকট কাটাতে। অর্থাৎ রাজনীতি এবং রাজকীয় অর্থনীতি পরিচালিত হতো রাজা এবং তার সামন্তবর্গের স্বার্থের জন্যে। ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু রাজ্ স্বার্থে ধর্মর নীতি রাজারা অতিক্রম করতেন তা তিনি হিন্দুই হন বা মুসলমানই হন। জনারাজা কতৃক লিখিত দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণী সুলতান জৈন উল আবেদীন(১৪২০ -১৪৭০) এর সময়ে লেখা হয়। তিনি দেখিয়েছেন কি ভাবে কাশ্মীরে মুসলমান রাজবংশ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু রাজবংশর জায়গা নিয়েছে। জৈন উল আবেদীন এই রচনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর পরে তৃতীয় রাজতরঙ্গিনী লেখেন জনারাজার শিষ্য শ্রীভর সুলতান জৈন উল আবেদীন এর সময়ে।

কিন্তু ইসলাম কাশ্মীরে তার পূর্বতন কাশ্মীরি সত্বা কে অস্বীকার করে বিকশিত হয় নি। বরং তার অতীতের সাথে সংলাপের মধ্যে দিয়ে একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক রূপ লাভ করেছে। কাশ্মীরে শৈব প্রভাব ছিল সংস্কৃতির মধ্যে। লালেশ্বরী (১৩২০-১৩৯৪ খৃস্টাব্দ ) জন্ম গ্রহণ করেন পান্ডরেথান এ কাশ্মীরি পন্ডিত পরিবারে। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি সন্যাস গ্রহণ করেন এবং শৈব গুরু সিদ্ধ শ্রীকণ্ঠর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিকা বলে এক শৈব ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার রচিত বাক বা অজ্ঞেয়বাদী কবিতা কাশ্মীরে নানাধারার সন্তদের প্রভাবিত করে। এবং মুসলমানদের মধ্যে লাল্লা আরিফা নামে পরিচিত হন। এই সময়ে কাশ্মীরের সুফী সন্তদের মধ্যে ঋষি ধারার বিকাশ ঘটে। ঋষি সন্তরা একাকিত্বে বিশ্বাস করতেন এবং নির্জনে জপ করতেন।তারা নিরামিশ আহারী ছিলেন। এদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শেখ নূর উদ -দিন -ওয়ালী যিনি শেখ উল -আলাম নামেও অভিহিত হন। আবার তার জনপ্রিয় নাম হলো নান্দ ঋষি । ইনি হিন্দুদের মধ্যে সাহাজানান্দ বলে পরিচিত। ইনি লালেশ্বরীর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস যে তিনি লালেস্বরীর স্তন্য পান করেন এবং তাকে মা হিসাবে ডাকেন। তার কবিতা শরুখস নামে পরিচিত। বাবা নাসিব -উদ -দিন গাজী পারসী ভাষায় নূর নামা রচনা করেন নান্দ ঋষির মৃত্যুর প্রায় দুশো বৎসর পরে। নান্দঋষির লেখায়

ক্রমাগত হিন্দু- মুসলমানের ঐক্যের বাণী প্রচারিত হয়। ঊনবিংশ শতাধীর হিন্দু সন্ত পন্ডিত মির্জা কক কাশ্মীরে অতি পরিচিত নাম। ইনি অনন্তনাগ জেলার হাঙ্গুলগুন্ড এর সন্ত। এর লেখাতেও ত্বহিদ এর ধারণার প্রভাব রয়েছে। কাশ্মীরের এই সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অনেকেই নেহরুবাদি জাতীয়তা বাদী মিথ বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু এই ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

**ডোগরা রাজত্বে কাশ্মীরি পণ্ডিত সমাজ**

১৮৪৬ খ্রিস্টাধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জম্মুর রাজা গুলাব সিং কে কাশ্মীর বিক্রি করেন। সেই থেকে ১৯৪৭ খৃস্টাধ পর্যন্ত কাশ্মীর ডোগরা শাসকদের অধীনে ছিল এবং ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহে ডোগরা রাজা বিদ্রোহি সিপাহিদের দমনে অংশ গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর আস্থাভাজন হন। ডোগরা শাসকরা কাশ্মীরে একধরণের সামন্তবাদী প্রথা চালু করেন। কাশ্মীরের ডোগরা আমলে পন্ডিত সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তারা সবচেয়ে উর্বর জমিগুলোর মালিকানা পান এবং সরকারি কর্মচারী হিসেবে তাদেরএকে নিযুক্ত করা হয়। গ্রামাঞ্চলেও অন্য কৃষকদের জোর করে শ্রম দানের ব্যবস্থা থাকলেও পন্ডিত সমাজ ব্রাহ্মণ হিসাবে এর থেকে নিষ্কৃতি পান। ডোগরা আমলে পন্ডিত সমাজ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। তারা সুদের ব্যবসাতে গ্রামাঞ্চলে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং কাশ্মীরের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় পন্ডিত সমাজের বসতি গড়ে ওঠে এই সময় দিল্লির চাঁদনি চকে কাশ্মীরের একটি পন্ডিত পরিবার খালের ( নহর ) ধারে বসবাস করার জন্য নেহেরু নামে পরিচিত হন। এবং পরবর্তীকালে এই পরিবারে মতিলাল , জহরলাল এবং ইন্দিরা জন্ম গ্রহণ করেন।

তবে ডোগরা আমলে জম্মু-কাশ্মীরে সাধারণ মানুষের অবস্থার অবনতি হয় তারা প্রভূত করভারে ঋণে জর্জরিত হন। দারিদ্র তাদের গ্রাস করে ফেলে এবং বহু কৃষক কাশ্মীরের বাইরে পাঞ্জাবে রেল কুলি হিসেবে কাজ নেন যাতে করে তারা কর শোধ করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে এই কৃষক রা ঋণগ্রস্থ ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত সমাজের অর্ধমন্যদের কাছে। এবং সেই কারণে ১৯৩১ সালে যখন মিরপুর অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তখন কাশ্মীরি পণ্ডিত সুদের ব্যবসায়ীরা মুসলমান কৃষকদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তবে মূলগত ভাবে ধর্মীয় ভিত্তিতে দেখতে গেলে পন্ডিত সমাজ কাশ্মীরের সাধারণ সমাজের তুলনাতে অনেক স্বচ্ছল ছিলেন ডোগরা আমলে। ১৯৩০ এর দশকে পন্ডিত সমাজে সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। জাতপাতের বিরুদ্ধে বিধবা বিবাহের সপক্ষে সংস্কারকরা মনোযোগ দেন। এই মুক্তমনা সংস্কারকদের অনেকে শেখ আধুল্লাহর সঙ্গে হাত মিলান ডোগরা সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে। কাশ্যপ বন্ধু , শ্যামলাল সারাফ , জিয়া লাল কইলাম প্রভৃতি পন্ডিতরা ন্যাশনাল কনফারেন্স এর আন্দোলনে যোগ দেন।

**স্বাধীন ভারতে কাশ্মীর**

স্বাধীনতার পর শেখ আধুল্লাহর সময়ে যে ভূমি সংস্কার অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার পরিবারগুলি একান্ত ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এই জমিদার পরিবারের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন ডোগরা ও পন্ডিত সম্প্রদায়ের এবং তার ফলে বেশ কিছু পন্ডিত সমাজের মানুষ কাশ্মীরের বাইরে চাকরির সন্ধান করেন এবং দিল্লিতে একটি বিশেষ বসতি গড়ে ওঠে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের। ভারতে তাঁরা তাদের শিক্ষার জোরে গুরুত্বপূর্ণ স্থান আমলাতন্ত্রে অধিকার করেন এবং শ্রীমতি গান্ধির সময় তার ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন প্রখ্যাত গণ সমাজতন্ত্রী কাশ্মীরি চিন্তাবিদ পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন ত্রিলোকী নাথ কাউল। আর ভারতের গুপ্তচর বিভাগ টুজ্ঞ এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামেশ্বর নাথ কাও । আর এক কাশ্মীরি পন্ডিত দুর্গাপ্রসাদ দ্বার ছিলেন সোভিয়েত দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত। এরা চারজনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালিদের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কিন্তু এদের মধ্যে দুজনের জন্ম কাশ্মীরের বাইরে। অর্থাৎ কাশ্মীর পন্ডিত সমাজ বিংশ শতাধীর গোড়া থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাশ্মীরের পন্ডিত দের একটি অংশ শেখ আধুল্লাহর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে। দূর্গাপ্রসাদ দ্বার নিজে শেখ আধুল্লাহর ১৯৪৬ সালের মহারাজা কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলনে সহযোগী ছিলেন। প্রেমনাথ বাজাজ ছিলেন তার সহযোগী। এমনকি প্রেমনাথ বাজাজ ভারতে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি করণের বিরোধী ছিলেন এবং আধুল্লাহ তাঁকে জেলে ভরেন ১৯৪৭ এ । পণ্ডিত রঘুনাথ বৈষ্ণভি পিপল'স কনফারেন্স এর নেতা ছিলেন এবং তিনি কাশ্মীরের স্বাধিকার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন ১৯৫০ এর দশকে ।

স্বাধীন ভারতে কাশ্মীরে শিক্ষা প্রসার ঘটেছে, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান হয়েছে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে মানুষ কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সুমিত গাঙ্গুলীর মতে এই পরিবর্তন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিসরের প্রসার আনেনি বরং গণতান্ত্রিক পরিসর ক্রমান্বয়ে সীমায়িত হয়েছে। ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে শেখ আধুল্লাহ কে সরিয়ে

দেওয়া হয়। তারপর থেকে কাশ্মীরে গণতন্ত্র খর্ব করে একের পর এক প্রধান (মুখ্য) মন্ত্রী বসানো হয়। বক্সি গুলাম মোহাম্মদ রাজত্ব করেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩। খোজা শামসুদ্দিন ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তার সময়েই কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্তে মুখ্য মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এই সময় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ঘটে। এর পরে সায়েদ মীর কাসিম কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হন। এই সময়টাতে কাশ্মীরে এক ধরণের অসন্তোষের ফাল্গু ধারা বয়ে যায়। কাশ্মীরি মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে ভারতের গণতন্ত্রে আশ্বাস হারায় নির্বাচনকে প্রহসনে রূপান্তরিত করার জন্যে। কাশ্মীরের পন্ডিত সমাজ ভারতের শাসনের সমর্থক ছিলেন যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই এই নির্বাচনী প্রহসনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু স্বাধিকার রক্ষার লড়াইতে তারা গৌণ ছিলেন। তাদের জন সমর্থন ছিল সীমিত।

১৯৭১ সালে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে সার্বিক পরিবর্তন ঘটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে। বাংলাদেশে পাকিস্তানের ভূমিকা বহু কাশ্মীরি নেতার মধ্যে পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বার্থ দেখার বিষয়ে সন্দেহ ঢোকায়। যে শাসকরা নিজের দেশের মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করতে পারে তারা কিভাবে কাশ্মীরের স্বাধিকার রক্ষা করবে এই সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীও এই সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থেকে পিছু হটে । এই পরিবর্ত পরিস্থিতিতে শেখ আধুল্লাহ শ্রীমতি গান্ধির সঙ্গে ১৯৭৫ সালে চুক্তি করেন । এর ফলে বিরোধী রাজনীতিতে যে শুন্যতা তৈরী হয় তা মূলত ভারত থেকে বিচ্ছিন্নবাদীদের প্রাধান্য দেয়। অন্য দিকে শেখ সাহেব বা তার পুত্র কেউই পুরোনো স্বাধিকার ফেরত আনতে অক্ষম হন। শেখ সাহেবের মৃত্যুর পরে পুরো আশির দশক এইভাবে চলে ।১৯৮৭ সালে আবার নির্বাচনে কারচুপি হয়। কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতি তখন অন্যরকম। আফগান যুদ্ধ তখন পরিসমাপ্তির মুখে। ভারতেও আস্তে আস্তে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঢেউ উঠছে। সেনাপতি জিয়া উল হক ঐস্লামিক পরিবর্তন আনতে চান পাকিস্তানে। পাকিস্তানের এর দিক থেকে আন্তর্জাতিক জেহাদিরা দৃষ্টি ফেরায় কাশ্মীরে দিকে। পাকিস্তানে অবস্থিত জেহাদিরা কাশ্মীরে তাদের সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি

বাংলাদেশে পাকিস্তানের ভূমিকা বহু কাশ্মীরি নেতার মধ্যে পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বার্থ দেখার বিষয়ে সন্দেহ ঢোকায়। যে শাসকরা নিজের দেশের মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করতে পারে তারা কিভাবে কাশ্মীরের স্বাধিকার রক্ষা করবে এই সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

করে।সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের মুখে ফলে প্রতিবাদী রাজনীতি সমাজতান্ত্রিক এবং পুনর্বণ্টনের রাজনীতির থেকে পরিচিতি বোধের জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকছে।

## ১৯৮৯ কাশ্মীর থেকে পন্ডিত সমাজের নিষ্ক্রমণের পটভূমি

১৯৮৯ সালের সেই সময় কাশ্মীর একান্ত বিক্ষুব্ধ। ১৯৮৮ সালের ৩১ জুলাই জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (JKLF) সশস্ত্র অভুথ্যান শুরু করে ভারতের থেকে 'স্বাধীনতার' জন্যে। দুটি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে কাশ্মীরে। নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। অনেক উঁচু পদে অবস্থিত হিন্দু অফিসার দের হত্যা করা হয়। টিক্কা লাল টাপলু , সভাপতি কাশ্মীর ভারতীয় জনতা পার্টি খুন হন ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ , ৪ নভেম্বর ১৯৮৯ নীল কণ্ঠ গাঞ্জু , যিনি বিচারক হিসাবে কাশ্মীরের ' JKLF এর নেতা ' মকবুল ভাটের মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেন তাঁকে হত্যা করা হয়। এমনকি লাসা কৌল , শ্রীনগর দূরদর্শনের প্রধানের মৃত্যু ঘটে গুপ্ত ঘাতকের হাতে ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০তে । শ্রীনগরএ অবস্থিত দুটি সংবাদ মাধ্যম আলসাফা এবং শ্রীনগর টাইমস ১৬ এপ্রিল ১৯৯০ , হিজবুল মুজাহিদীন এর একটি চরম পত্র প্রকাশ করে। বিশেষত আলসাফা তে ১৪ এপ্রিল ১৯৯০ এ প্রকাশিত একটি চরম পত্রে বলা হয় সমস্ত কাশ্মীরি পন্ডিতদের জম্মু ও কাশ্মীর পরিত্যাগ করতে হবে দু দিনের মধ্যে। জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন দিল্লির জরুরি অবস্থায় যিনি দিল্লির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে সঞ্জয় গান্ধির সহযোগিতা করেছেন সেই গণতন্ত্র প্রেমী জগমোহন! যদিও জগমোহন প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করেন কাশ্মীরিদের দমনের জন্যে। কিন্তু তিনি কাশ্মীরি পন্ডিত দের নিরাপত্তার কোনো আশ্বাস দেন নি। বরং মার্চ ১৯৯০ এ, দক্ষিণ কাশ্মীরের শহর অনন্তনাগ শহরে ,স্থানীয় বিধায়কের নেতৃত্বে কাশ্মীরি মুসলিমদের একটি প্রতিনিধি দল দেখা করে ভারত সরকারের এক পদস্থ কর্মচারী হাবীবুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে। তারা বলেন পন্ডিতরা কাশ্মীর পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন তাদের থামান। হাবীবুল্লাহ তাদের বলেন যদি তারা পন্ডিতদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন তাহলে অবশ্যই তিনি দূরদর্শনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এটি রাজ্যপাল জগমোহন কিন্তু সম্প্রচার করেন নি। বহু কাশ্মীরি

পন্ডিতদের তাদের মুসলমান প্রতিবেশীরা থেকে যাবার জন্যে মিনতি করেন কিন্তু পন্ডিতরা এতটাই ভীত ছিলেন যে তাঁরা কাশ্মীর ছেড়ে চলে আসেন। পরে জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্ররা একটি Survey করে ২০০১ সালে তাতে দেখা যায় যারা এই সার্ভে তে অংশ নিয়েছেন তাদের মাত্র 2% সরাসরি চরমপত্র পেয়েছিলেন কাশ্মীর ত্যাগের। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের অভিযোগ যে মন্দির ধ্বংস হয়েছে তা সরাসরি মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে কাশ্মীরের মুসলমানদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক শক্তি রয়েছে। সায়েদ আন্দ্রাবি জামায়াত -এর নেতা কাশ্মীরি পন্ডিত দের বিশ্বাসঘাতক বলেছেন এবং তাঁদের কাশ্মীর থেকে নিষ্ক্রমণের দাবি জানিয়েছেন।

আসলে ১৯৮৮-৮৯ -৯০ সালের হিংসা এবং রক্তপাত মানুষ কে বিচলিত করেছিল। ভয়ের থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হযেছিলো সেনানী এবং উগ্রবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষে। বহু মুসলমান কাশ্মীরি ওই সময়ে কাশ্মীর ছেড়ে ভারতে এবং বিদেশে আশ্রয় নেন। এমনকি রুবাইয়া সায়ীদ, মুফতি মুহাম্মদ সায়ীদ এর কন্যা কে পণবন্দি করে সন্ত্রাসীরা। ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রাক্তন মেজর এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও আমার বন্ধু মারুফ রাজা মনে করেন যে এটি পাকিস্তানী মদত পুষ্ট সন্ত্রাসিদের কৌশল ছিল। এতদস্বত্তেও সব কাশ্মীরি পন্ডিত কাশ্মীর ছেড়ে চলে আসেননি। দুটি পন্ডিত প্রধান গ্রামে লাইগামআ এবং ব্যান্ডই, উরির কাছে, এখনো প্রায় ১০০০ পণ্ডিত থাকেন । আজ ও কাশ্মীর উপত্যকায় প্রায় চার হাজার পন্ডিত বসবাস করেন। যদিও তাঁরা সুখে স্বস্তিতে আছেন একথা বলা যাবে না। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি মানুষের সুখ স্বস্তি নষ্ট করে দেয়।

**সংখ্যার রাজনীতি**

কাশ্মীরে পন্ডিত দের সংখ্যা জনসখ্যার অনুপাতে খুবই কম ছিল। ডোগরা মহারাজের সময়ে ১৯৪১ সালে জনগণনায় কাশ্মীরে পন্ডিতদের সংখ্যা ছিল ৭৮,৮০০। পরে স্বাধীন ভারত সরকার জনগণনাতে ধর্মর উল্লেখ বন্ধ করে দেয়। পানুন কাশ্মীর যে কাশ্মীরি পন্ডিত দের সংগঠন তাঁরা দাবি করেন যে ১৯৯০ সালে কাশ্মীরে পন্ডিত সমাজের সংখ্যা প্রায় ৭০০,০০০। কিন্তু জনসখ্যার হিসাবে এটি অতিরঞ্জিত দাবি বলে মনে হয়। পানুন কাশ্মীরের দাবি যে ভারত সরকার তাঁদের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে জনগণনার সময়ে। কিন্তু ব্রিটিশ ফরেন পলিসি ইনস্টিটিউটের বিদেশ নীতি বিশেষজ্ঞ আলেক্সান্ডার এভান্স এর মতে কাশ্মীরের ১৯৯০ এর মধ্যে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে হলে প্রতিদশকে পন্ডিত সমাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতে হবে ৪৫ু। এটা প্রায় অসম্ভব। এটা অসমম্ভব বিশেষত একটি অতি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যাদের ফার্টিলিটি ট্রুথষ্ঠত্র অনেক কম। ডেমোগ্রাফারদের মতে কাশ্মীরে ১৯৯০ সালে ১৬০,০০০ পন্ডিতসংখ্যা ছিল। ১৯৯০ সালের পর থেকে এই পন্ডিত সমাজের ১৬০০০০ এর মধ্যে অধিকাংশই ভারতের বিভিন্ন শহরে চলে গেছেন জীবন ও জীবিকার তাগিদে। যারা রয়েছেন প্রায় ৪০,০০০ এদের একটা বিরাট অংশ অত্যন্ত কষ্টে শরণার্থী শিবিরে জম্মুতে বাস করছেন। ১৯৯০ সালে থেকে ভারত সরকার প্রায় বৎসরে ৫০০,০০০ সৈন্য কাশ্মীরে নিরাপত্তার জন্য রেখে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো সরকারই পন্ডিত সমাজ কে কাশ্মীরে পুনর্বাসনের ব্যব্যস্থা করতে পারেন নি। আসলে সৈন্য দিয়ে সন্ত্রাসী দমন করে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরী করা যায় পারস্পরিক বোঝাপড়া করা যায় না। নিরাপত্তার ভিত্তি কিন্তু পারস্পরিক বোঝাপড়া।

পরিশেষ ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৯ কাশ্মীরে সৈন্য সমাবেশ বেশি ছিল না কিন্তু পন্ডিত এবং মুসলমানরা পরস্পরের সাথে সহাবস্থান করতেন। যদিও এই সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে জম্মু থেকে বহু মুসলমান বিতাড়িত হন কিন্তু কাশ্মীরে কোনোদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি। আজ সেখানে গত ত্রিশ বছরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেড়ে উঠছে কাঁদানে গ্যাস, কাঁটা তার, পেলেট চালনা এবং কারফিউ এর মধ্যে দিয়ে। কেউ ধর্মের কারণে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন আর কেউ নিরাপত্তা বাহিনীর ভয়ে ভীত । প্রায় ৪০০০০ লোক সংঘর্ষে মারা গেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন পেশিশক্তির জাতিয়তাবাদ মানুষ কে কখনো শান্তি দিতে পারে নি। পারবেও না। ভারত এবং পাকিস্তানের এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যদিও কোনো ধর্মে বিশ্বাস করি না, তবুও শেষ করতে চাই কাশ্মীরের সন্ত ঋষি শেখ নুরউদ্দিন এর সুরখ দিয়ে যিনি সুহা ভাটএর পন্ডিতদের উপর অত্যাচার দেখে লিখেছিলেন-

We belong to the same parents.
Then why this difference?
Let Hindus and Muslims (together)
Worship God alone.
We came to this world like partners.
We should have shared our joys
and sorrows together. ❐

পরিবেশ

# হিমালয়ের বিপর্যয় মানুষের স্বকৃত নিয়তি

রাহুল রায়

**কথাসার**

বেশ কিছুদিন ধরেই পশ্চিম হিমালয় নানান সংবাদ-শিরোনামে। উত্তরাখণ্ডের ধরালি থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল বর্তমানে হড়পা বান, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং ভূমিধসের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে অবস্থিত হিমাচল প্রদেশ গত কয়েক বছর ধরে প্রাকৃতিক রোষের মুখোমুখি। জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানুষের অবিবেচক কাজকর্ম এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হলেও,স্থানীয়ভাবে 'গাদ' বা 'গাদেরা' নামে পরিচিত ছোট উপনদী ও নদীগুলির দিকে খুব কম মনোযোগই দেওয়া হয়েছে। দেখা গিয়েছে, ক্ষীর গঙ্গা (গাদ), বিরাহি গাদ এবং অসি গঙ্গার মত এই ছোট জলধারাগুলি গঙ্গা, অলকানন্দা, ভাগীরথী ও চেনাবের মতো বড় নদীর তুলনায় অনেক বেশি বিধ্বংসী। ১৯৭০ সালের অলকানন্দা বন্যা থেকে শুরু করে ১৯৭৮ সালের ভাগীরথী বন্যা এবং এখন ২০২৫ সালের ধরালি বিপর্যয় পর্যন্ত এসব ছোট নদী ও জলধারার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বারবার আমরা দেখেছি। তাই, এই অঞ্চলের জলবিদ্যা (হাইড্রোলজিক্যাল) ব্যবস্থা ভাল করে খতিয়ে দেখে এবং সমগ্র হিমালয়ের আহরণ (ক্যাচমেন্ট) ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের বিপর্যয় মোকাবিলার রূপরেখা তৈরি করা অতিজরুরি। সর্বোপরি, এই গাদ-গাদেরাগুলি গঙ্গা, যমুনা, শতদ্রু এবং ঝিলাম-এর মতো নদীর উৎস। সংকীর্ণ উপত্যকা এবং খাড়া ঢাল-এর মধ্যে প্রবাহিত এসব ছোট নদী দ্রুত জলরাশি এবং ক্ষয়াবশেষ স্তূপ (ডেব্রিজ) নিচের দিকে টেনে আনে। এর ফলেই হড়পা বান এবং ক্ষয়াবশেষ স্তূপপ্রবাহ ঘটে।

**হিমালয়ের প্রকৃতি**

হিমালয় পৃথিবীর নবীনতম ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণি। হিমবাহের অবক্ষেপ (মোরেন) দিয়ে গড়া এর পাহাড়ি ঢালএখনও সুস্থিত নয়। এ অঞ্চলের মাটি আলগা, ঝুরঝুরে। ফলে মাটির ক্ষয় বেশি। সবচেয়ে বড় বিপদের কথা

> হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ভারতের সব কটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলো কখনোই বাস্তুতান্ত্রিকভাবে টেকসই ও ন্যায্য নয়।

হিমালয় ভূমিধসপ্রবণ এবংউচ্চ-ভূকম্পপ্রবণ অঞ্চল। এসবের সঙ্গে যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অ-মরশুমি চরম বৃষ্টিপাত। ভূ-উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়ের অধিকাংশ অঞ্চলে শীতকালীন উষ্ণতা বেড়েছে। ফলে হিমবাহের গলন বেড়েছে। গঙ্গা নদীর উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ গলে প্রতি বছর প্রায় ৯-২০ মিটার পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে হিমবাহের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে বরফের ধস নামছে। হিমবাহের অত্যধিক গলনে অবক্ষেপ-ঘেরা হিমবাহ হ্রদের সৃষ্টি হয়। ভূ-আলোড়নে এগুলো ফেটে গিয়ে ভয়ংকর হড়পা বানের মতো এসব হ্রদের জল সমতলে নেমে আসে। এরকমই এক ঘটনা ঘটেছিল আমাদের পড়শি রাজ্য সিকিম-এ বিগত ৩ অক্টোবর, ২০২৩, মাঝরাতে লোনাক হিমবাহ হ্রদের অবক্ষেপ-ঘেরা দেওয়াল ফেটে গিয়ে।

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বেশ কয়েকটি নামী পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। এগুলো ভয়ানক ভূমিধসপ্রবণ। এদের মধ্যে কুলু, শিমলা (হিমাচল প্রদেশ), চামোলি (উত্তরাখণ্ড), গ্যাংটক (সিকিম) এবং দার্জিলিং (পশ্চিমবঙ্গ) অতিমাত্রায় ধসপ্রবণ। এই ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০০৭ সালে যেখানে ভূমিধসের মোট ঘটনা ছিল ৫২টি, ২০১৭ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৮৫টি।

**বিপন্ন হিমালয়,বিপর্যয়ের সারি**

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ভারতের সব কটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলো কখনোই বাস্তুতান্ত্রিকভাবে টেকসই ও ন্যায্য নয়। উত্তরাখণ্ড-এর জোশিমঠ, তেহরি জেলার চাম্বা, কর্ণপ্রয়াগ, নৈনিতাল সহ উত্তরাখণ্ড-এর বহু বাড়ি, রাস্তায় ক্রমাগত ভূমিধসের ফলে বড় ফাটল দেখা গিয়েছে। উত্তরাখণ্ড-এ যত্রতত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়া, অবাধে বনাঞ্চল সাফ করেপাহাড় ফাটিয়ে ও নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করে নদীর পাড় বরাবর বড়

চওড়া রাস্তা তৈরি করা, ব্যাঙের ছাতার মতো গজানো হোটেল, রিসর্ট ও বাড়ি তৈরি, অলকানন্দা নদীর দুপারের নুড়ি-পাথর ও মাটি তুলে নেওয়া ইত্যাদির ফল আজকের এই বিপর্যয়। ক্রমাগত এই বিপর্যয়ে সৃষ্টিহবে পরিবেশ শরণার্থী।

এই বছর বর্ষায় চরম আবহাওয়ার কবলে বিপর্যস্ত হিমালয়ের অঞ্চলগুলির তালিকায় এক মাসের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে হিমাচল প্রদেশ-এর মান্ডি, উত্তরাখণ্ড-এর ধরালি, জম্মু ও কাশ্মীর-এর কিশতোয়ার-এরপরে উত্তরাখণ্ড-এর চামোলির নাম জুড়েছে। এগুলো স্রেফ কোন ভারী বৃষ্টিপাতের ফল নয়। এগুলোর প্রতিটিই দেখিয়ে দিচ্ছে, পরিবর্তিত বৃষ্টিপাতের ধরন, ভূতত্ত্ব এবং লাগাম ছাড়া যত্রতত্র নির্মাণ কাজ কীভাবে বন্যা এবং ভূমিধসকে ঘাতকে পরিণত করছে।২০২৫ সালের প্রায় প্রতিটি দিনই হিমালয় সংকটের মধ্যে রয়েছে। 'ইন্ডিয়াজ অ্যাটলাস অন ওয়েদার ডিজ্যাস্টার্স'-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দিল্লি-র 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' (সিএসই) জানাচ্ছে,১ জানুয়ারি থেকে ১৮ অগাস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত হিমালয়ের ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২৩০ দিনের মধ্যে ২২১ দিন (৯৬ শতাংশ) চরম আবহাওয়া ছিল। আবহাওয়ার এই বিপর্যয়ে ৬৩২ জনের প্রাণ গিয়েছে, যা বিগত চার বছরের তথ্যে সর্বোচ্চ। এই অঞ্চলে ২০২২ সালে ৩৬৫ দিনে ২৩১ দিন (৬৩ শতাংশ) চরম আবহাওয়া বিরাজ করেছিল। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে দিনের এই সংখ্যাটি ছিল যথাক্রমে ২৫০ (৬৮ শতাংশ) এবং ২৫৫ (৭০ শতাংশ)। বিগত তিন বছরে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১০৫৮ (২০২২), ৮৩৭ (২০২৩) এবং ৮৭০ জন (২০২৪)।

হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে নয়টি মেঘভাঙা-বৃষ্টি এবং একটি অতি ভারী বৃষ্টির ফলে গ্রাম, বাগান এবং সেতুর পরিকাঠামো ধ্বংস হয়।এখানকার এক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ১ জুলাই, ২০২৫-এ১৪০.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত নথিভুক্ত হয়েছে, যা স্বাভাবিক ৬.৯ মিলিমিটারের থেকে ১৯৪০ শতাংশ বেশি। ২৫ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল স্বাভাবিক গড়ের তুলনায় ৪৮২ শতাংশ বেশি। ফলাফলও ছিল ভয়াবহ। ২০ অগাস্টের মধ্যে রাজ্যটির বর্ষায়মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৮০ জন, নিখোঁজ বেশ কিছু এবং আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বেশ কয়েক কোটি টাকা।

পশ্চিম হিমালয়ের উত্তরাখণ্ড-এর ধরালি-তে ৫ অগাস্ট, ২০২৫ ভয়াবহ হড়পা বানের পরে অঞ্চলটি পুরোপুরিবানভাসি হয়ে ধস্ত হয়েছিল। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, ধরালি-র ওপরে একটি হিমবাহ হ্রদ ভেঙে ক্ষীর গাদ-এ কাদাধসের সৃষ্টি করেছে। 'ভারতীয় আবহাওয়া সংস্থা'-র বর্তমান সভাপতি আনন্দ শর্মাজানাচ্ছেন, যেখানে বন্যা বা হড়পা বান দেখা দিয়েছে, তার আহরণ ক্ষেত্রে কত বৃষ্টিপাত হয়েছে তা দেখা দরকার, যার কারণে এটি উপচে পড়েছে। ধরালি-তে গিয়ে দেখতে হবে ক্ষীর গাদ-এর কোন উপনদীতে প্রচুর জল ছিল কিনা, যা এতে ঢুকেছে। দেরাদুন-এর 'ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজি'-রএক বরিষ্ঠ হিমবাহ-বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ (উপগ্রহ তথ্য) এখনও মেলেনি।

বিগত ১৪ অগাস্ট, ২০২৫ জম্মু ও কাশ্মীর-এর কিশ্তোয়ার জেলার পাদ্দার আথোলি মহকুমার প্রত্যন্ত চাশোতি গ্রামে এক বিশাল মেঘভাঙা-বৃষ্টি হয়। এই বিপর্যয়ে জেলা কর্তৃপক্ষের মতে প্রায় ৩৮ জনতীর্থযাত্রী, যাঁদের অনেকেরই কিশ্তোয়ার শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে. মাচাইল মাতা মন্দিরে যাচ্ছিলেন বা ফিরে আসছিলেন, মারা যান।১৪ অগাস্ট সকাল ১১টা নাগাদ মেঘভাঙা-বৃষ্টিতে চাশোতি নালা এবং দাসনি নালা উপচে১৫ অগাস্ট এক হড়পা বানে গ্রামটিকে (তীর্থযাত্রার বেস ক্যাম্প) পুরো ভাসিয়ে দেয়। এতে বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যানবাহন পুরু কাদাস্তরের নিচে চাপা পড়ে। প্রায় ২০০ জন মানুষ, যাদের বেশিরভাগই তীর্থযাত্রী, এখনও নিখোঁজ। কয়েকশো মানুষ আহত। এই ঘটনার পরে কর্তৃপক্ষ তীর্থযাত্রা বন্ধ রেখেছেন।

শ্রীনগর-এর আবহাওয়া কেন্দ্রের জেলাওয়ারি সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৫ অগাস্ট কিশ্তোয়ার-এ মাত্র ৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। আগের দিন কোন বৃষ্টি হয়নি। চাশোতি-তে কোন আবহাওয়া কেন্দ্র নেই। তাই সেখানে কী পরিমাণ মেঘভাঙা-বৃষ্টি হয়েছিল, তার কোন তথ্য মেলেনি। শ্রীনগর আবহাওয়া কেন্দ্রের অধিকর্তা মুখতার আহমদ অবশ্য বলেছেন, উপগ্রহ এবং ডপলার রাডার-এচাশোতি-তে ভারী বৃষ্টি দেখা গিয়েছে। চাশোতি-র উচ্চ অঞ্চলগুলি লাদাখ-এর জাঁসকার-এর সাথে যুক্ত। সুতরাং, সম্ভবত কোন হিমবাহ বা হিমবাহ হ্রদ ভেঙে বন্যারআকার নিতে পারে। আনন্দ শর্মা বলছেন, ধরালি বা চাশোতি-র মতো অঞ্চলে দূরবর্তী উপনদীগুলিতে অতিবৃষ্টির বাড়তি জল সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার কারণে বন্যা হতে পারে।

এখানে বলার, রোজ কয়েক হাজার তীর্থযাত্রী পাদ্দার আথোলি-তে এসে যানবাহনে ২৫ কিলোমিটার দূরে চাশোতি-তে যান। কয়েক বছর আগেও তীর্থযাত্রীরা

চাশোতি থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে মাচাইল মাতা মন্দিরে হেঁটে যেতেন।বিগত কয়েক বছর ধরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই ১৫ কিলোমিটারজুড়ে লম্বা রাস্তা তৈরি করছেন। 'জম্মু ও কাশ্মীরের পাহাড়ে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রাস্তা নির্মাণ এবং পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে তার পরিণতি ভয়াবহ। চাশোতি-তে আমরা শুধু একটি সতর্ক-সংকেত পেয়েছি মাত্র। আগামী দিনে এটি আরও বিপজ্জনক হতে পারে। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে গভীর ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন', বলছেন শ্রীনগর-এর বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী ফয়েজ বকশি।

**অপরিকল্পিত উদ্ধত উন্নয়ন**

পশ্চিম হিমালয়ে, বিশেষত উত্তরাখণ্ড রাজ্যে'যেমন খুশি সাজো'র মতো নগরায়নহয়েছে। পরিকল্পনাশূন্য উন্নয়নে যেখানে-সেখানে মাথা তুলেছে আকাশছোঁয়া বহুতল। পর্যটক টানতে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়েছে হোটেল, রিসর্ট। গড়া হয়েছে এশিয়ার উচ্চতম ও দীর্ঘতম রজ্জুপথ, চারধাম প্রকল্পের ঝাঁ চকচকে রাস্তা, ৪২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিষ্ণুপ্রয়াগ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং জাতীয় তাপ বিদ্যুৎ নিগমের (এনটিপিসি) ৫২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তপোবন-বিষ্ণুগড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত চারধাম প্রকল্পের উচ্চ ক্ষমতাশালী কমিটি-র সদস্য পরিবেশবিদ হেমন্ত ধ্যানিজানিয়েছেন, হিমালয়ের এই অঞ্চলের ভঙ্গুর ভূতাত্ত্বিক গঠনের কথা জেনেশুনেও সরকার এখানে বিষ্ণুপ্রয়াগ ও তপোবন-বিষ্ণুগড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ছাড়পত্র দেয়, যে-কাজে মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হচ্ছে। হিমালয়ের বরফ গলা জলে পুষ্ট বেগবতী ও দীর্ঘ নদীগুলি নির্মল শক্তি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযুক্ত হলেও এ প্রশ্ন থেকেই যায় যে, কতগুলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এখানে করা উচিত? কীভাবেই বা গড়ে ওঠা প্রকল্পগুলির ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব? প্রকল্পগুলি গড়ে তোলার সময় এই উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক এবং ভূমিরূপগত অবস্থার কথা বিবেচনায় ছিল তো? আরও বলার যে, এ অঞ্চলের দীর্ঘকালীন বন্যার তথ্য নদীগুলির চরিত্র বিশ্লেষণে অতি জরুরি বলে জানাচ্ছেন বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ নবীন জুয়াল। কারণ সেইমতো তবে নদীশাসন করার পরিকল্পনা নেওয়া উচিত।

ভারতের মোট ৮১টি বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ভূকম্পপ্রবণ হিমালয়ের কোলে১৩টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে আরও২৬টি প্রকল্পের কাজ চলছে। উল্লেখ্য, ২০০৭-১৭ সালের মধ্যে এসব অঞ্চলে ১,১২১টি ভয়াবহ ধস নেমেছে (লাদাখ-এ ২৩টি, জম্মু ও কাশ্মীর-এ ২৩৮টি, উত্তরাখণ্ড-এ ২০৬টি, হিমাচল প্রদেশ-এ ১৭৭টি, অরুণাচল প্রদেশ-এ ৭২টি, সিকিম-এ ৫০টি, অসম-এ ৮৯টি, নাগাল্যান্ড-এ ৮৮টি, মেঘালয়-এ ৩৮টি, ত্রিপুরা-য় ৫টি, মিজোরাম-এ ৩৬টি এবং মনিপুর-এ ৯৯টি)। এমন বিপর্যয়ের পরেও আরও ৩২০টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হিমালয়ের কোলে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডজুড়ে বর্তমানে প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার রাস্তা আছে। ২০০০ সালে যখন এটি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়, তখন রাজ্যজুড়ে রাস্তা ছিল ৮,০০০ কিলোমিটার। প্রতি কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে ২০-৬০,০০০ ঘনমিটার রাবিশ সৃষ্টি হয়। এর মানে, ২০০০ সাল থেকে এই রাজ্যে রাস্তা তৈরির ফলস্বরূপ প্রায় ২০ লক্ষ ঘনমিটার রাবিশ সৃষ্টি হয়েছে। আর এই রাবিশ জমা করা হয়েছে পাহাড়ি ঢালে। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে এবং বৃষ্টির জলে ধুয়ে তা জমেছে নদীর বুকে। ফলে নদীগুলি ক্রমশ অগভীর হয়েছে। পাহাড়ি গাছপালাও এর ফলে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে এইচ এন বিগাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ এস পি সাটি জানিয়েছেন। আরও একটি দুশ্চিন্তার বিষয় হল, এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩১.৭ শতাংশ নিকাশিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত।পশ্চিম হিমালয়ের বেশির ভাগ অঞ্চলেইসুষ্ঠু বর্জ্য-জল নিকাশি ব্যবস্থা নেই।

**মৌসুমি বায়ু ও পশ্চিমি ঝঞ্ঝার যুগলবন্দী**

এই বছর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু কেবল এক সপ্তাহ আগেই আসেনি, বরং এটি আরওশক্তিশালী হয়েছে অস্বাভাবিকভাবে বেশি সংখ্যক পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ও মধ্য অক্ষাংশীয় ঝড়ের দ্বারা,যেগুলি সাধারণত শীত ও বসন্তকালে ভারতকে প্রভাবিত করে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর-এর তথ্য অনুযায়ী ১ জুন থেকে ২০ অগাস্ট,২০২৫-এর মধ্যে ১৪টি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা (জুন মাসে ৫টি, জুলাই মাসে ৫টি, ২০ অগাস্ট পর্যন্ত ৪টি) ভারতে দেখা গিয়েছে। এদের মধ্যে কমপক্ষে ৪টি শক্তিশালী ঝঞ্ঝা, পাঁচ থেকে সাত দিন স্থায়ী ছিল। ভারতে সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ-এর মধ্যে ৪ থেকে ৬টি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে এগুলি কম হয়, কারণ উপক্রান্তীয় পশ্চিমা জেট বায়ু উত্তর দিকে সরে যায়।

যখন পশ্চিমি ঝঞ্ঝা মৌসুমি খাত-কে (দীর্ঘায়ত নিম্নচাপ স্তর, যা মৌসুমি বৃষ্টিপাতকে পরিচালনা করে) ছেদ করে,তখন ফলাফল বিধ্বংসী হতে পারে। এর অন্যতম উদাহরণ ২০১৩ সালের উত্তরাখণ্ড-এর বিধ্বংসী বন্যা। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার গ্রীষ্ম

ও বর্ষাকালীন কার্যকলাপ বাড়ছে। এটি সুমেরু এবং উত্তর উষ্ণায়নের সাথে যুক্ত উপক্রান্তীয় জেট বায়ুরসরে যাওয়ার এক প্রবণতা। এগুলি হিমালয়ের পাদদেশের আর্দ্রতাকে বাড়িয়ে তুলছে। ফলে হড়পা বান ও মেঘভাঙা-বৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি এর প্রভাবে মুম্বাই, গুজরাট, উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং পাকিস্তানেও অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলিকে আমরা পশ্চিমি ঝঞ্ঝার সাথে মিশিয়ে ফেলছি বলে জানাচ্ছেন মুম্বাই-এর'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'-র জলবায়ু-বিদ্যার অধ্যাপক রঘু মুর্তুগুড্ডে।

**বিজ্ঞানীরা কী বলছেন**

বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনকে উচ্চ হিমালয়ে ভারী এবং দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাতের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায় দ্রুততরহারে উষ্ণ হচ্ছে। এই উষ্ণায়নে প্রতি কিলোগ্রাম বাতাস আরও বেশি জলীয় বাষ্প ধরে রাখছে। ফলত জোরালো ঝড়ের সঙ্গে ভারী বৃষ্টি তীব্র ও অনিয়মিতভাবে দেখা দিচ্ছে। খাড়া উল্লম্ব উপত্যকায় সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিজলও অবক্ষেপগুলিকে ঢাল বেয়ে ঝুরঝুর করে নিচে নামিয়ে আনছে। এখানে বলাব,'হিমালয় পলিসি ক্যাম্পেন'-এর কুলভূষণ উপমন্যু সতর্ক করেছেন,বাঁধ ও জলাধারগুলিতেক্ষয়িত জৈব পদার্থ থেকে মিথেন নির্গত হলে খুব ছোট পরিসরে স্থানীয় জলবায়ুকে উষ্ণ করতে পারে। এমন অবস্থায় ভারী বৃষ্টিপাত বিপর্যয়ের রূপনেয়।

এসপি সাটিজানাচ্ছেন,খাড়া অবক্ষেপপূর্ণ আহরণ ক্ষেত্রে তুলনামূলক সামান্য জলবৃদ্ধির ফলেও পরপর ভূমিধস,ক্ষয়াবশেষ স্তূপপ্রবাহ এবং বন্যা দেখা দেয়।ক্ষীর গাদ-এ বারবার বন্যা হয়েছিল অঞ্চলটিতে অবক্ষেপের শাখাগুলিতে সমপরিমাণ জলের সম্পৃক্তির ফলে। এত খাড়াই সংকীর্ণ উপত্যকার এক অংশে ভূমিধস হলে অন্যান্য হিমবাহের শাখাগুলিতেও অতি দ্রুত তা ঘটতে থাকে। ফলে একাধিক বন্যা দেখা দেয়।

ভূখণ্ড ও মানুষের
হঠকারী কাজকর্ম --
অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ,
নদীশাসনে বাঁধ দেওয়া এবং
নির্বিচারে বনভূমি সাফ --
যা ভূতাত্ত্বিকভাবে
ভঙ্গুর ভূমিঢালকে
অস্থিতিশীল করে তুলছে।

এমনই বন্যা ও ক্ষয়াবশেষ স্তূপপ্রবাহ ধরালি-র বাজারকে নিশ্চিহ্ন করেছে।ধরালি ও নিকটবর্তী হরশিল শৈলশহর ১২ মিটার পুরু কাদাময় ক্ষয়াবশেষস্তূপ-এর নিচে চাপা পড়েছে। এমনকি ভাগীরথী নদীকে ও মুখওয়া-র দিকে তার গতি পরিবর্তনে বাধ্য করেছে।

**ছোট নদী কেন বেশি ধ্বংসাত্মক**

হিমালয়ের সংকীর্ণ উপত্যকা এবং ৪০-৫০ ডিগ্রির খাড়া ঢাল জল এবং ক্ষয়াবশেষ স্তূপপ্রবাহকে ত্বরান্বিত করে। ভারী বৃষ্টি ও তুষারগলা জলে ফুলেফেঁপে ওঠা এসব নদী মাটি, পাথর, গাছ এবং বড় গোলাকার পাথরগুলিকে নিচের দিকে বহন করে এক ক্ষয়াবশেষ স্তূপপ্রবাহ অঞ্চল-এর সৃষ্টি করে। এই অঞ্চলের মধ্যে কোন বসতি বা বাজার থাকলে (ধরালি-তে যেমন দেখা গিয়েছে) ধ্বংসটি আরও বড় আকার নেয়। এই ছোট নদীগুলি বড় নদীগুলিকে সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ করে হ্রদ গঠন করতে পারে। সম্প্রতি ধরালি-র কাছে অন্য একটি নদীর বয়ে আনা ক্ষয়াবশেষ স্তূপ ভাগীরথী-তে একটি হ্রদ তৈরি করেছে।

পুনে-র 'ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি' ২০২২ সালে এক সমীক্ষায় নিশ্চিত করেছে, উষ্ণায়নে জলবায়ু পরিবর্তনেপশ্চিম হিমালয়ের বায়ুমণ্ডলে বিগত ৫০ বছরে আর্দ্রতা বেড়েছে। হিমবাহ গলে হিমবাহ- হ্রদ ফেটে হড়পা বান দেখা দিচ্ছে। 'আন্তর্জাতিক জলবায়ু কেন্দ্র'-এর সমীক্ষা অনুযায়ী হিমালয়ের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ হড়পা বান ছোট নদীগুলির স্রোতধারার সাথে সম্পর্কিত, যেগুলি উচ্চ অঞ্চলের ভারী বৃষ্টিপাত বা

তুষারগলা জল দ্রুত বহন করে আনে। তাই গোটা আহরণ ক্ষেত্রের সমীক্ষা না করে কোন পূর্বাভাস বা

প্রতিরোধ বেশ অসম্ভব। হিমালয়ের জলচক্র ব্যবস্থা জটিল।এরই দোসর হয়েছেজলবায়ু পরিবর্তন, বন্ধুর

ভূখণ্ড ও মানুষের হঠকারী কাজকর্ম -- অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ,নদীশাসনে বাঁধ দেওয়া এবং নির্বিচারে বনভূমি সাফ -- যা ভূতাত্ত্বিকভাবে ভঙ্গুর ভূমিঢালকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। মূল কেন্দ্রীয় থার্স্ট (ধাক্কা বা সংঘট্ট) অঞ্চলে অবস্থিত ধরালি-র মতো জায়গায়, যেখানে পাথর ফেটে গিয়েছে,সেখানে ভাগীরথীর কাছে নির্মাণ কাজ ক্ষয়াবশেষ স্তূপপ্রবাহকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ২০২৩ সালে ধ্বংস হওয়া সিকিম-এর তিস্তা-IIIবাঁধ এরকম আর একটি উদাহরণ।

**চেতাবনি-সংকেত উপেক্ষার ফল এই বিপর্যয়**

ধরালি-তে এমন বিপর্যয় যে ঘটতে পারে সে-পূর্বাভাস আগেই ছিল। ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে বন্যায় গ্রামটিতে জল ও পলির পরিমাণ বেড়ে যায়। ২০১৩ সালের বন্যার পরে এখানে সুরক্ষাকারীএক প্রাচীর তৈরি হয়। কিন্তু স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এটি সেরকম কোন সুরক্ষা দিতে পারেনি। তাঁরা প্রশাসনের কাছে নদীর কাছাকাছি নির্মাণকাজ বন্ধ করার,ক্ষয়াবশেষ স্তূপ সরিয়ে নিয়ে অবরুদ্ধ নদীখাতগুলিকে পরিষ্কার করার আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসন সে কথায় কান দেয়নি। উদ্ধত উন্নয়ন এবং বেপরোয়া পর্যটনের মাধ্যমে হিমালয়কে আয়ের উৎস হিসেবেই স্রেফ দেখা হয়েছে।

**হিমালয়ে বিপর্যয় ফিরে দেখা**

অতীতে বহুবার হিমবাহ হ্রদ ফেটে হিমালয়ে ধ্বংসাত্মক বন্যা হয়েছে। ১৯৭০ সালে অলকানন্দা নদীতে বন্যায় বিরাহিগাদ, পাতালগঙ্গা এবং অন্যান্য নদী প্রচুর ক্ষয়াবশিষ্ট স্তূপ বয়ে এনে ব্যাপক ধ্বংসসাধন করে। ১৯৭৮ সালে উত্তরকাশী-তেকানোদিয়া গাদ ভূমিধস ঘটিয়ে গাঙ্গনানি-তে ৩০ মিটার উঁচু এক অস্থায়ী বাঁধ সৃষ্টি করে,দাবরানি-তে এক হ্রদ সৃষ্টি করে ভাগীরথীকে অবরুদ্ধ করে, যেটি ভেঙে যাওয়ায় ভাগীরথীতে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঋষি গঙ্গা এবং ধৌলি গঙ্গায় হিমানী সম্প্রপাত এবং হিমবাহের গলনেতপকেশ্বর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ধ্বংস হয় এবং ২০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৯৮ সালে পিথোরাগড়-এর মালপাগাদ-এ বন্যায় ২২১ জন মারা যায়। ২০১৩ সালে চোরাবারি হ্রদ ফেটে এবং ছোট নদীগুলির বয়ে আনা ক্ষয়াবশেষস্তূপে কেদারনাথ-এর মন্দাকিনী নদীর উপত্যকা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এতে ৫৭০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা যান। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে উত্তরাখণ্ড-এর চামোলি জেলার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত অতি বিপজ্জনক ভূকম্পপ্রবণ অঞ্চল-৫ জোশিমঠ-এ ভূমিধসে বিপর্যস্ত হওয়ার ঘটনা এখনও আমাদের স্মৃতিতে সজীব। এই ঘটনায় জোশিমঠ-এর অনেক রাস্তা এবং প্রায় ৪৫০০ পাকা বাড়ির ৮৬৩টি-তে দেখা দিয়েছিল বিশাল ফাটল।বিপর্যয়ে ঘরছাড়া হয়েছিল ২৯৬টি পরিবার। উত্তরাখণ্ড সরকারকেও ঘোষণা করতে হয়েছিল জোশিমঠ পুরসভার ৯টি ওয়ার্ডই বিপজ্জনক ও বসবাসের অযোগ্য।

**কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা**

কেন্দ্রীয় আবাসন এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনস্থ 'টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন'-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে সিএসইজানাচ্ছে, হিমালয়ের উপরিউক্ত ১৩টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত কোনও টিয়ার-১শহর (আদমশুমারি, ২০০১ অনুযায়ী জনসংখ্যা এক লক্ষের বেশি) অথবা মেট্রো-শহর (জনসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি) -- কারোরই অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করার কোন মাস্টার প্ল্যান নেই। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কারগিল ও লেহ্ (লাদাখ),কুলু (হিমাচল প্রদেশ), শিলং (মেঘালয়), ইটানগর (অরুণাচল প্রদেশ), কোহিমা ও ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড), ইম্ফল (মনিপুর) এবং আইজল (মিজোরাম) - মাত্র এই আটটি শহর কেন্দ্রীয় সরকারিপ্রকল্প 'অটল মিশন ফর রেজুভিনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফর্মেশন'-এর অধীনে তাদের খসড়া মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে।

**শেষের কথা**

'ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ'-এর ২০১৯ এবং ২০২২ সালের প্রতিবেদনে হিমালয়ের বেশ কিছু অঞ্চলকে অতি বিপর্যয়প্রবণ বলা হয়েছে। হিমালয়ের আগের সব দুর্ঘটনা থেকে রাষ্ট্র কোন শিক্ষাই নেয়নি।হিমালয়ের বিপর্যয় এড়াতে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের ভারী বা অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা,কৃত্রিম মেধাভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং বিস্তৃত রাডার নেটওয়ার্ক কার্যকরী সতর্কতা-ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে। যেকোনও ধরনের উন্নয়ন কার্যসূচি হাতে নেওয়ারআগে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, ঝুঁকিপ্রবণ-অঞ্চল নির্ধারণ এবং কঠোর ভূমি-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। ক্ষয়াবশেষস্তূপপ্রবাহ অঞ্চলে নির্মাণকার্য নিষিদ্ধ করতে হবে। জলবায়ু-সহনশীল রাস্তা,

সেতু, চেকড্যাম এবং ভূমিঢালের স্থিতিশীলতা, ব্যাপক বনায়ন এবং সনাতনী জল-সংরক্ষণ প্রথা এক প্রাকৃতিক বাফার-এর সৃষ্টি করবে। ব্যাপক বনায়ন এবং আগাম উন্নত সতর্কবার্তা বিপদের সম্ভাবনা কমায়।

এখানে বলার, বিগত ২৬ অগাস্ট, ২০২৫ 'জাতীয় পরিবেশ আদালত' উত্তর কাশ্মীর-এর কুপওয়ারা জেলায় প্রায় ১০০০ গাছ কেটে ফেলার অনুমতি দেওয়ায় জম্মু ও কাশ্মীর সরকারকে তুলোধোনা করেছে। স্থানীয়

পর্যটন কেন্দ্র বাঙ্গুস উপত্যকার রাস্তা চওড়া করতে কুপওয়ারা বনাঞ্চলে কেন ৪৪৭টি পূর্ণবয়স্ক পাইন গাছ,৩৪০টি খুঁটি (পোপলস্) এবং দেওদার,কাইল এবংফারপ্রজাতির ২৩৬টিচারা কেটেফেলা হয়েছিল, আদালত রাজ্য সরকারের কাছে সেই কৈফিয়ত চেয়েছে। হান্দোয়ারা শহর এবং বাঙ্গুস-এর মধ্যে ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ

এই রাস্তা তৈরির প্রকল্পের জন্য জম্মু ও কাশ্মীর-এর বনবিভাগকে এখনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। ২০১৯ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। হান্দোয়ারা বিভাগের পূর্ত দপ্তর এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের জন্য বনবিভাগের ছাড়পত্র পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য কোন ছাড়পত্র বা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নেই।

হিমালয়ের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি,বিমাকরণ এবং জীবিকা-বৈচিত্র্য সৃষ্টিস্থানীয় জলবায়ু-সহনশীলতা আরও বাড়িয়ে তুলবে। পশ্চিম হিমালয়ের ছোট-বড় সমস্ত নদী-নালাগুলির জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনায় জোর দিতে হবে। গাদ-গাদেরার ওপর চেকড্যাম দিয়ে জলপ্রবাহের তীব্রতা কমাতে হবে। এতে ভৌমজলস্তর আবার ভরে উঠে জলের নতুন উৎস সৃষ্টি হয়ে জল-সংরক্ষণে সহায়তা করবে। এই কাজ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে। তবে হিমালয়ের জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রের সদিচ্ছা এবং সুরক্ষা প্রদানকারী জলবায়ু-সহনশীল কর্মসূচিতে সরকারি বিনিয়োগ। কিন্তু রাষ্ট্র যদি ধৃতরাষ্ট্র হয়? ❐

ভ্রমণ

# শেষ শরতের চিঠি মার্কিন মুলুক থেকে

সিদ্ধার্থ সেন

এ দেশে এসেছি বেশ কিছু দিন। তখন গরম ছিল। দুপুরে, বিকেলে অনায়াসে একটা হাফ শার্ট গায়েদিয়ে বেরোনো যেত। দুপুরে রোদ্দুর ছিল চড়া। বাইরে বেরোলে মাথায় একটি টুপি দিয়ে বেরোনোই ভাল। তবে, একটা সুবিধা, এদেশে ঘাম নেই, তাই অনেক আরামপ্রদ। এখন আস্তে আস্তে গরম কমে আসছে। বিকেলের রোদ্দুর রাত সাড়ে আটটার বদলে এখন সাড়ে ছটায় চলে যায়। সন্ধ্যের দিকেশিরশিরে ঠান্ডাও লাগে, একটা সোয়েটার গায়ে দিয়ে নিচে নামলে আরাম লাগে। দুপুরবেলায় ঝুলবারান্দায় বসে রোদ পোহাতে ভালোই লাগে। তবে ঠান্ডা হাওয়াটা মাঝে মাঝেই বিরক্ত করে। তখন ঘরথেকে পাতলা কম্বলটা এনে গায়ে জড়িয়ে চেয়ার টেনে বসি। এ গলির দুপাশে পাঁচ তলা ফ্ল্যাটের সারি। নিচ দিয়ে মাঝে মাঝে লোকজনকে দেখা যায় কুকুর নিয়ে হাঁটতে। বাকি সময় গলিটা জনশূন্য; শুধু কিছুগাড়ি চলাচল করে নিঃশধে। গলিটা গিয়ে মিশেছে একটা বড় রাস্তায়। তার ওপারেই আছে একটা ইহুদি কবরখানা, ঢোকার মুখের অফিস ঘর এখান থেকেই দেখা যায়, তার গায়ে একটা তারা আঁকা। আর দেখা যায় সারি সারি কবর। এ বাড়ির উল্টো দিকে একটা ম্যাপেল গাছ। আর কিছুদিন পর এইগাছে লাল ছোপ ধরবে। জানিয়ে দেবে, শীত আসছে। তারপর সমস্ত গাছের পাতা লাল হয়ে যাবে।সাথে ঠান্ডা কনকনে বাতাস। ততদিনে অবশ্য এখানে থাকব না। শরতের আমেজ থাকতে থাকতেই দেশে পাড়ি দেব।

এসেছি মেয়ের কাছে, আমেরিকার পূর্ব প্রান্তের এক শহরে। সেখানে মেয়ে-জামাই থাকে, সারাদিনই কাজে ব্যস্ত। আমাদের দুজনের অবসর জীবনে তাড়া নেই। রান্না করে, বই পড়ে আর বারান্দা দিয়ে প্রকৃতি উপভোগ করে সময় কাটছে দিব্যি। শুধু শনি-রবিবার গাড়ি করে আশে পাশের কিছু জায়গায় ঘুরতে যাওয়া , ছবি তোলা, আর তা বন্ধুবান্ধবদের পাঠিয়ে তাদের প্রশংসার জন্য অপেক্ষা করা, এটাই রুটিন। মাঝে মাঝে সন্ধ্যা বেলা ওরা নিয়ে যায় বাজার করতে। আলু, কুমড়ো বেছে দিই, মাছটা ভাল হবে কিনা মতামত দিই, আবার গাড়ি করে ফিরে আসি। চেনা লোকের সাথে দেখা হয় কম। শুধু ছোট ইন্ডিয়ান স্টোরটায় ম্যাথিউ আঙ্কেলের সাথে সামান্য পরিচয় হয়েছে। আমাকে দেখলে মুচকি হাসেন, জামাইয়ের সাথে মাঝে মাঝে সুখ-দুঃখের গল্প চলে। আমেরিকায় অবশ্য আমাদের এই প্রথম নয়, গতদশ বছরে এই নিয়ে চারবার। প্রথম দুবার মেয়ে যখন পড়াশোনা করত, পরের দুবার সে চাকুরীতে ঢোকার পরে। দুটো অবশ্য ভিন্ন শহরে। এর মধ্যে ওদের চার হাত এক হয়েছে। কাজেই এই বাড়িটা এখন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নয়, আর আয়তনে অনেকটা বড়।

গেল দশ বছরে পরিবর্তন যে দেখিনি তা নয়। এবার এসে প্রথম যা চোখে পরল তা হলো, চীনা লোকের সংখ্যা যেন আগের থেকে কমে গেছে। সত্যি কিনা জানি না, শুনলাম চীনা ছাত্র ছাত্রীরা এদেশে আর বিশেষ পড়তে আসছে না। চাকুরীরত চীনারাও শুনলাম দেশে চাকরি নিয়ে ফিরে

যাচ্ছে। আর গত দশ বছরে ভারতীয় লোকজনের সংখ্যা বেড়েছে। সবাই যে প্রথম প্রজন্ম, তা নয়, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রজন্মওআছে। অবশ্য ভারতীয় বলতে শুধু ভারতবর্ষের অধিবাসীরা নয়, তার সাথে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা মিলিয়ে সবার কথা বলছি, কারণ দেখে তফাৎ করা মুশকিল। এই ছোট শহরে প্রতিবার এসে দেখছি, নতুন নতুন বড় বড় ভারতীয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলছে, তাতে বিশেষভাবে ভারতীয় সামগ্রী, তেল, ঝাল, সবজি, মশলা, চানাচুর, মিষ্টি - সবই পাওয়া যায়। আগে দেখতাম, দেশ থেকে আসার সময় সবাই শুকনো খাবার, মশলা, সাথে করে আনত, এখন আর সেটা দরকার পরে না। নিউ জার্সি শহরে গিয়ে দেখলাম এক জায়গায় মুখোমুখি দুটি বিরাট বড় মিষ্টির দোকান। তার একটাতে সকালবেলা সুস্বাদু গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে । আমাদের এই ছোট শহরটাতেও এক মলে সেদিন রাতের শোতে বাংলা সিনেমা দেখে এলাম , জয়া আহসানের 'ডিয়ার মা' । আমি অবশ্য সিনেমার ব্যাপারে একেবারেই অর্বাচীন। মেয়ে যখন সিনেমার নামটা বললো, আমি শুনলাম 'দিয়া র মা'। বলে উঠলাম, 'কি সব ছাইপাশ সিনেমার নাম'! তবে সিনেমা হলে লোক হয়েছিল ভালোই, দুই বাংলার লোককেই পেলাম।

আর একটা ব্যাপার চোখে পড়ল এবার এসে, ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই তাদের চাকরী নিয়ে বেশ আতঙ্কিত। এমনিতে এদেশের চাকরীজীবি ভারতীয়রা সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় বা নানা আই টি কোম্পানির মত জায়গায় তারা মোটামুটি ভালো মাইনের চাকরি করে। কিন্তু ইদানিং অনেকের মধ্যেই একটা উৎকণ্ঠা মনে মনে। ইন্টেল, আমাজন এর মত বড় বড় কোম্পানিতে যারা আছে, তাদের অনেকেরই ছাঁটাই হবার ভয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অধ্যাপনা করে, তাদের চিন্তা, এই বুঝি গবেষণার সরকারি গ্রান্ট কাটা গেল। পয়সা দিয়ে পড়তে আসা বিদেশী ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে। এবার বুঝি অধ্যাপকদেরও চাকরি যায়। ছাত্রদের আতঙ্ক, ভিসা পুনর্নবীকরণ করতে দেশে গেলে আবার আমেরিকা ফিরে আসার অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা। যারা ডিগ্রী শেষ করতে যাচ্ছে, তাদের ভাবনা, পাশ করার পরে এদেশে দু- তিন বছর শিক্ষানবীশ হিসেবে থেকে যাবার যে সুযোগ আছে তার অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা।

> এই সব প্রবাসী ভারতীয়রা
> এবার দল বেঁধে
> ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছিল।
> ভেবেছিল, ট্রাম্পের
> সাথে বন্ধুত্বের ফলে
> তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের
> অনেক সুবিধা হবে।
> ট্রাম্প শপথ নেবার পরে
> সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানাতে
> প্রধানমন্ত্রী মোদী আমেরিকা
> উপস্থিত হয়েছিলেন।
> কিন্তু সেটা
> যে বুমেরাং হয়ে যাবে
> তা কেউ ভাবে নি।

এমনিতেই এবছর এদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র ভর্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে। এতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের রোজগারও এক তৃতীয়াংশ কমে গেছে। সবকিছুতেই অনিশ্চয়তা। এটা বেড়েছে ট্রাম্প আসার পরে। তার সাথে নতুন যোগ হয়েছে ভারতীয় পণ্যের উপরে পঞ্চাশ শতাংশ শুল্ক চাপানো লাগু হওয়ার পরে।

সেদিন ম্যাথিউ আঙ্কেল এর সাথে তাঁর দোকানের ভিতরে আমাদের কিছু খোশ গল্প হচ্ছিল । আমি অবশ্য শ্রোতা । উনি চিন্তিত, বলছিলেন, ভারতীয় জিনিসের যোগান কম । দাম বেড়ে যাচ্ছে, এবার কেউ কিনবে না। দোকানের তাকগুলি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা কি উঠে যাবে? বললাম, ভারতীয় জিনিস না আসলে তো কি? বাংলাদেশ, পাকিস্তানি পণ্যের উপরে শুল্ক তো কমই থাকবে। কিছু বললেন না। বুঝলাম উত্তরটা পছন্দ হল না। সেই পণ্যগুলি তো আবার নতুন এজেন্টদের মাধ্যমে আনতে হবে। আবার কিছু দিনের অনিশ্চয়তা। জানলাম, এই সব প্রবাসী ভারতীয়রা এবার দল বেঁধে ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছিল। ভেবেছিল, ট্রাম্পের সাথে বন্ধুত্বের ফলে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হবে। ট্রাম্প শপথ নেবার পরে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানাতে প্রধানমন্ত্রী মোদী আমেরিকা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা যে বুমেরাং হয়ে যাবে তা কেউ ভাবে নি।

ট্রাম্পের পাগলামির কথা সর্বজনবিদিত। গতবারেও মেক্সিকোর অভিবাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া, দক্ষিণ সীমান্তে পাঁচিল দেয়া নিয়ে নাটক অনেকেরই মনে আছে। কিন্তু এবার এসেই যে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের কোমরে দড়ি বেঁধে দেশে ফেরাবে সেটা কেউ ভাবতে পারে নি। তার উপর ভারতীয় পণ্য আমদানির উপরে পঞ্চাশ শতাংশ শুল্ক ! কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। এর উপর এলো H1B ভিসার কোপ। বিদেশ থেকে আমেরিকায় গিয়ে যারা চাকুরী করতে যায় তাদের সে দেশে ঢোকার অনুমতির জন্য প্রয়োজন H1B ভিসা। তার জন্য আবেদন

করতে গেলে দরকার পড়তো যে কোম্পানিতে কাজ করতে যাবে সেখান থেকে একটি চিঠি ও ভিসা ফি, যা এতদিন ছিল ২০০০ থেকে ৫০০০ ডলারের মধ্যে । পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে এই ভিসা নিয়ে আসা কর্মীদের মধ্যে ভারত থেকে আসা লোকের সংখ্যাই সর্বাধিক। হঠাৎ করে ঘোষণা হল, ভিসা ফি বেড়ে হবে ১০০,০০০ ডলার। আর এই নির্দেশ জারি করাহল শুক্রবার বিকেলে; আর তা লাগু হল এক দিন বাদে, রবিবার থেকে। তাও সেই নির্দেশে এর আওতায় কারা পড়বে, এই টাকাটা প্রতি বছর দিতে হবে না এককালীন, কিছুই বলা হলো না। এর ফলে এই সব কর্মী ও তাদের পরিবারদের কতখানি দুর্ভোগের মধ্যে যে পড়তে হলো, তার বৃত্তান্ত আমরা সবাই পেয়েছি। তুঘলকি আচরণ আর কাকে বলে?

অথচ গত নভেম্বরের নির্বাচনে ট্রাম্প সংখাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটেই জিতেছিল ; যাদের মধ্যে ভারতীয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাদা আমেরিকান, কালো ও আরব ভোটার। ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারের মুখ্য স্লোগান ছিল আমেরিকাকে আবার মহান করা। সমস্ত শিল্প চিনে ও অন্যান্য দেশে চলে যাচ্ছে। তাই সমস্ত শিল্পপতিকে ঘাড় ধরে নির্দেশ দিতে হবে এদেশে আবার আইফোন, মোটরগাড়ি, ইলেকট্রনিক চিপ তৈরির কারখানা সব ফিরিয়ে আনতে হবে। তা না হলে তাদের এদেশে ব্যবসা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে দেশের মানুষের চাকরি হবে। আমেরিকার সার্বিক উন্নতি হবে। এরকম সব কথা দেশেরএকটা বড় অংশের লোকের মনে ধরেছিল। না হলে তার আগের পর্বের শাসনের অভিজ্ঞতা থেকেট্রাম্পের দ্বিতীয়বার নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা ছিল না।

ট্রাম্প নিজে আবার বড় ব্যবসায়ী। তার পাগলামো সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত থাকলেও, একটা কথা কিন্তু সবাই মানে। নিজের ব্যবসাটা সে ভালোই বোঝে এবং এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেবে না যাতে নিজের কিছু ক্ষতি হয়। তাই সরকারের অর্থনৈতিক ঘাটতি কমাতে বড়োলোক শ্রেণীর উপর আয়কর বাড়াতে সে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। সেই সাথে তার আপাত-অসংলগ্নতার আড়ালে নিজের স্বার্থরক্ষার বিরুদ্ধে কোনো কাজ সে করবে না।

(WTO) অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে গঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। তার মুখ্য কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের দাভোস শহরে হলেও মূল উদ্যোক্তা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গ্যাট চুক্তি বা General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) এ সই করার জন্য প্রতিটি দেশের উপরে চাপসৃষ্টি করা হয়।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, মুক্ত বাণিজ্যের পথিকৃৎ কিন্তু আমেরিকা। বিশ্ব মুক্ত বাণিজ্য সংস্থা বা, World Trade Organization (WTO) অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে গঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। তার মুখ্য কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের দাভোস শহরে হ লেও মূল উদ্যোক্তা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গ্যাট চুক্তি বা General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) এ সই করার জন্য প্রতিটি দেশের উপরে চাপসৃষ্টি করা হয়। এই চুক্তির মূল কথা ছিল (ক) মুক্ত বাণিজ্যের পথে বাধা দূর করা (খ) বিশ্বের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাড়ানো এবং (গ) বাণিজ্যে নিজের দেশের পণ্যকে সুরক্ষিত করার প্রবণতাকে বাতিল করা। বলা হয়েছিল, এই মুক্ত অর্থনীতিই পৃথিবীর নতুন বাণিজ্যিক সম্পর্ককে দিশা দেখাবে। এর মূলকথা, যেখানে কাঁচা মাল সহজে উপলব্ধ, শ্রমিক -এর মজুরি কম, সেইখানেই কারখানা হবে, দেশের সীমান্তের বেড়া সেখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না।পণ্য চলাচলের উপরে শুল্ক আরোপ করে সেখানে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। লক্ষণীয়, GATT চুক্তি প্রণয়ন হয় রাশিয়া ভেঙে যাবার পর।চীন তখন তার প্রাচীর ফাঁক করে সবে পশ্চিমী দুনিয়াতে উঁকি মারা শুরু করেছে। অনেক টানাপোড়েনের পড়ে অবশেষে চীন ২০০১ সালে WTO তে যোগ দেয়। এর মধ্যে অনেক দেশই WTO র সভ্য হয়ে গেছে।

নতুন পরিস্থিতির প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি দেখা গেল। সফটওয়্যার ক্ষেত্রে ভারতে কম পারিশ্রমিকে কাজ করার মত দক্ষ শ্রমিক অনেক, তাই তাদের দলে দলে চালান করো মার্কিন মুলুকে যেখানে কম পয়সায় সফটওয়্যার শিল্পে কাজ করার লোকের অভাব। তাতে বাড়লো TCS, WIPRO , INFOSYS ইত্যাদি কোম্পানির কদর। তারা প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করে বিদেশের বড় বড় কোম্পানির এই সব কাজ করার বরাদ নিল। দূর সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বেশির ভাগ কাজই ভারত থেকে করা সম্ভব হল। আবার কিছু ইঞ্জিনিয়ারকে বিদেশে পাঠানো হল কাজের জায়গায় সেগুলি রূপায়িত করতে। তাদের মধ্যেকিছু নির্দিষ্ট সময় পরে ফিরে এলো, কিছু আবার চাকরি পাল্টে আমেরিকার বাসিন্দা হয়ে গেল। সেইসাথে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ভারত থেকে অনেক বেশি ছাত্র যাওয়া শুরু করল।এদের মধ্যে অনেকেই আবার স্নাতক স্তরে পড়ার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করে।

অপর দিকে খোদ আমেরিকার বুকে কারখানায় কোন জিনিস উৎপাদন করার খরচ বেশি। কারণ শ্রমিকদের মজুরি বেশি। তাই বড় বড় কারখানাগুলি ছাড়িয়ে পড়ল নানা দেশে, যেখানে শ্রমিকদের মজুরি কম। বেশ কিছু কারখানা গেল মেক্সিকোয়, কিছু গেল চিনে। আই সি চিপ তৈরির কারখানা সব পাততাড়ি গোটালো আমেরিকা থেকে। কিছু গেল চিনে, কিছু তাইওয়ান, কিছু দক্ষিণ কোরিয়ায়। চীনথেকেও দলে দলে ছাত্র আমেরিকায় পড়তে এল। তাদের মধ্যে বেশ কিছু বুদ্ধিমান মেধা আমেরিকায় চাকরি নিয়ে থেকে গেল। চীনের বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠল। এই সব কারখানার মালিক ছিল বিভিন্ন মার্কিন কোম্পানি; কারিগরি প্রকৌশলের জন্য তাদের পুরোটাই আমেরিকার উপরে নির্ভর করতে হত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চীন এইসব প্রযুক্তি দ্রুত আয়ত্ত্ব করে নিল ।নতুন নতুন চীনা কোম্পানি তৈরি হল। তাদের উৎপাদনের মান ও যথেষ্ঠ উন্নত। দ্রুত চীন শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক অগ্রণী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলো।

এই দুই স্রোতের চাপে আমেরিকার উচ্চ মেধার কাজের লোক বাড়লো বটে, কিন্তু চাকরি গেল বেশ কিছু মধ্য মেধার লোকের, যারা এই সব কারখানায় কাজ করত। ওয়াশিংটন পোস্টের প্রাক্তন সাংবাদিক ডেভিডজে লিঞ্চ একটি প্রতিবেদনে ওহাইয়োর এক কারখানার শ্রমিকদের কথা লিখেছেন, যাদের সাথে তাঁর ২০০৮ সালে দেখা হয়েছিল। সেই সময়ে তাদের কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়ে মেক্সিকোর এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে চলে যাচ্ছে। আর কাজ হারানো শ্রমিকেরা তখন তাদের শেষ কটি কাজের দিনে মেক্সিকোর কারখানার হবু শ্রমিকদের ট্রেনিং দিচ্ছে।

বস্তুতঃ বিশ্বায়নের ফলে যাদের শিক্ষাদীক্ষা অল্প, কারখানার সাধারণ মেশিন অপারেটর বা এই ধরনের কাজ করে,আমেরিকার সেই সব লোকেরাই সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানকার কারখানাগুলো অনেক বন্ধ হয়ে গেছে। আবার নতুন জায়গায় নতুন চাকরি খুঁজে নেবার 'স্কিল' ও তাদের নেই। তারাইএই পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েছে। আর এরাই এখন ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় সমর্থক। লিঞ্চ তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন , ২০১৬ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের সমর্থনে ভোট দেওয়া মানুষদের ৬৪ শতাংশ মানুষ মনে করতো, বিশ্বায়নের ফলে আমেরিকানদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বেশি।আর ওই নির্বাচনে ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিল সাদা আমেরিকানরা, যাদের কোন কলেজে ডিগ্রীনেই। ওই জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭১ শতাংশের ভোট ট্রাম্পের সমর্থনে গেছে, যেখানে হিলারি ক্লিনটন পেয়েছে ২৩ শতাংশ। ২০২৪ এর শেষ নির্বাচনে এই ফল অন্যথা হয়েছে বলে মনে হয় না। আরএই লোকগুলোর সমর্থনের উপরে ভরসা করে ট্রাম্প তার যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই সব লোকের আর্থিক উন্নতি কিন্তু তার লক্ষ্য নয়। শেষ পর্য্যন্ত তার আরোপিত বিধিনিষেধ টিকবে না আইনের রায়ে বাতিল হবে বলা মুশকিল, কিন্তু এই সব করে সাধারণ মানুষের মূল সমস্যা, যেমন, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বাড়িভাড়া, সামাজিক পরিষেবার উপরে আঘাত ইত্যাদি থেকে মানুষের চোখ ঘুরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকখানি সফল। আর সেই সাথে নজর সবচেয়ে বেশি বড়লোকদের উপরে কর বাড়ানোর দাবি যেন আর না ওঠে। এই দিক দিয়ে ট্রাম্পের লক্ষ্য স্থির।

কাজেই যে আমেরিকা এক সময়ে সমগ্র বিশ্বে তার অর্থনৈতিক দাপট বাড়ানোর জন্য মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে জোর গলায় প্রচার করে এসেছিল, সেই মুক্ত বাণিজ্যই শেষ অবধি আমেরিকাকে এক গভীর সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে। দেশের স্বল্প শিক্ষিত সাদা মানুষেরা আজ চাকুরী হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত। এরই মধ্যে দেশপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসেছে ট্রাম্পের মতো এক বিকারগ্রস্ত মানুষ।তার তুঘলকি কার্যকলাপে নানা ক্ষেত্রে ডামাডোল চলছে। কাজেই দেশটির অস্থিরতা সহজেই অনুমেয়।

আজ থেকে মোটামুটি একশো বছর আগে আমেরিকা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অবস্থা তখন পড়তির দিকে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টাতেই ইউরোপ থেকে প্রচুর বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক আমেরিকায় গিয়ে ঘর বাঁধতে থাকে। আর গোটা একশো বছর ধরে আমেরিকা প্রায় একছত্রভাবে ছড়ি ঘুরিয়েছে। শিল্প বাণিজ্যে বিশ্বায়নের কথা এই দেশটিই গত তিরিশ বছর ধরে বলে গেছে। কিন্তু এই বিশ্বায়নই একদিন আমেরিকার পতন ডেকে আনবে কিনা তা সময়ই বলবে। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ লোকের কাছে আজকের দিনে বিশ্বে সামগ্রিক এই অস্থিরতা খুবই চিন্তার ব্যাপার। ❐

# গাজা পূর্ণ দখলদারির লক্ষ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি

মনিরুল হক

'সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ;
গাছের আড়ালে, বলো
কে স্থির দাঁড়িয়ে -
আলো নিয়ে।
বাড়ি ফিরেছি।
জারুলের বেড়া; কাঁকর পথ থামবে দরজায়;
আমার পৃথিবী
এইখানে শেষ।'

এটাই তো বাড়ি ফেরার ছবি। আমার, আপনার, জনমানুষের এবং অবশ্যই প্রিয় কবি অমিয় চক্রবর্তীর। কিন্তু আজ সামাজিক মাধ্যমে এ কী ছবি দেখছি আমরা? এ কেমন বাড়ি ফেরা? হাজারে হাজারে মানুষ বাড়ি ফিরছেন কিন্তু বাড়ির চিহ্ন মাত্র নেই! কবির ভাষা ধার করে বলতে হয় - বাড়ি তো নেই, বাড়ির দিকে যাওয়া'। স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল-অফিস-আদালত, গুঁড়িয়ে আছে সব। ধ্বংসস্তুপের নিচে শত শত মানুষের পচা-গলা দেহ। ফল আর ফসলের ক্ষেতের কোন অস্তিত্ব নেই। ভাঙা দরজার ওপারেও নেই প্রিয় কোন মানুষের স্বর। অপেক্ষা করে আছে অসীম শূন্যতা আর গভীরত অনিশ্চয়তা। জানি, প্রখর জীবনীশক্তিকে সম্বল করে প্রকৃতির ন্যূনতম সহযোগীতায় আবার মুখরিত হয়ে উঠবে এই জনপদ। কিন্তু কিভাবে, কোন পথে মানুষ ফিরবে কাঙ্খিত সেই জীবনে?

বুঝতেই পারছেন, আমি বলছি গাজার কথা।

আমি বলতে চাইছি ফিলিস্তিনের কথা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ যখন একটু স্বস্তির নিশ্বাস নিচ্ছে সেই সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভূত চেপে বসল ফিলিস্তিনের ঘাড়ে। সমস্ত নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে, আন্তর্জাতিক আইন-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, প্রগতি-আধুনিকতা-নিরপেক্ষতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তথাকথিত ঈশ্বরের তথাকথিত 'Promised Land' গড়ে উঠল ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে। আজব এক অজুহাতে মিত্রশক্তির মদতে পাল্টে গেল ফিলিস্তিনের ভূগোল, অর্থনীতি, জনবিন্যাস। পাল্টে গেল মানুষের জীবনযাত্রা। পাল্টে গেল ফিলিস্তিনিদের লড়াইয়ের অভিমুখ। অন্য সব লড়াইয়ের সঙ্গে ১৯৪৮ সাল থেকে তাঁরা অবিরত লড়াই করছেন জীবনের অধিকার, ভূমির অধিকার, সীমানার অধিকারের জন্য। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্য যে যেসব রাষ্ট্রশক্তি স্বাধীন ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে বা দিচ্ছে, তারাই আবার প্রকারান্তরে ফিলিস্তিনিদের উপর ইজরায়েলের আগ্রাসন তথা আক্রমণকে ধারাবাহিকভাবে মদত দিয়ে যাচ্ছে!

পুনরায় স্বাধীন ফিলিস্তিন ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করা বিভিন্ন গোষ্ঠী একীভূত হয় ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশন (পি এল ও)-এর ছত্রছায়ায়। বহুদিন গেরিলা যুদ্ধ চালানোর পর পি এল ও বাস্তবতা মেনে নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসতে সম্মত হয়। এবং এর পরিণতিতেই ১৯৯৩ ও ১৯৯৫ সালে দু'দফায় সম্পন্ন হয় অসলো চুক্তি। ইজরায়েল ও পি এল ও, দু'পক্ষের সম্মতিতে এবং অংশগ্রহণে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় 'Palestine Authorety' যা PA বলেই সমধিক প্রচলিত। পি এল ও-র উদ্দেশ্য ছিল PA কে সামনে রেখে স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে ইজরায়েল সমেত সারা পৃথিবীতে জনমত গঠন করা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত কর এবং এভাবেই একদিন বাস্তবের 'স্বাধীন ফিলিস্তিন' গঠন করা। কিন্তু ইজরায়েল চাইছিল PA কে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখতে। ঠিক এই প্রেক্ষিতেই নতুন করে স্বাধীন প্যালেস্টাইন গড়ার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে হামাস। সশস্ত্র লড়াইয়ের অংশ হিসাবেই হামাস ২০২৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর অতর্কিত আক্রমণ হানে ইজরায়েলেল অভ্যন্তরে। নিহত হয় প্রায় ১২০০ জন মানুষ। ২৫১ জনকে বন্দী করে হামাস। এই অবস্থায় ইজরায়েলী আক্রমণ ছিল অবশ্যম্ভাবী। গত দু'বছর যুদ্ধের নামে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি একতরফা নৃশংস আক্রমণ। হামাস উচ্ছেদের নামে ২০ লক্ষ অধিবাসীকে মৃত্যু অথবা দেশত্যাগের ফরমান জারি করেছিল ইজরায়েল।

এই একতরফা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে দেশে দেশে। মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষত ইউরোপে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছে। গণহত্যাকারী হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। আন্তর্জাতিক আদালতের সমন জারি হয়েছে তাঁর নামে। ব্যক্তি হিসাবে এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেও তিনি পৃথিবীর সবদেশে যেতে পারছেন না গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে। নিজ দেশের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেও তিনি নিন্দিত হচ্ছেন বারে বারে। সেখানেও বড় বড় মিছিল-সমাবেশ সংঘটিত হচ্ছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, নেতানিয়াহুর

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। ফলে পশ্চাৎপসারণ তাঁকে করতেই হতো।

আমরা হয়ত ভুলে গেছি, এই বছরের প্রথম দিকে হামাস-ইজরায়েল একটা সমঝোতায় পৌঁছেছিল। কথা ছিল প্রথম দফায় হবে বন্দী বিনিময়। তারপর আরও দুই ধাপে হবে পূর্ণ যুদ্ধবিরতি। কিন্তু দু'পক্ষের কেউই সেই সমঝোতার সূত্র মেনে চলতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। ফলে আঁতুর ঘরেই মৃত্যু হয় সেই সমঝোতা সূত্রের। কিন্তু এইবারের লক্ষণ অন্যরকম। আশা করা যায়, এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন বন্দী বিনিময় কর্মসূচি অনেকটাই এগিয়ে যাবে।

গাজা অঞ্চল ছাড়াও লিবিয়া, সিরিয়া, জর্ডন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে ইরাণেও আক্রমণ শানায় ইজরায়েল। কিন্তু এরপর মত্ত নেতানিয়াহু কাতার আক্রমণ করে বসেন। সেখানে তখন চলছিল এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য হামাসের সঙ্গে কাতার কর্তৃপক্ষের এক আলোচনা। আক্রমণ হয় সেখানেই। মধ্যপ্রাচ্যে কাতার হল যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মিত্র। ফলে নিজেদের স্বার্থেই নতুন উদ্যমে আসরে নামেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তার পরেই তাঁর বিশ দফা।

এই বিশ দফায় কী আছে তা নিয়ে তেমন কেউ ভাবছেন না। বাতাসে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই করা হামাস এবং রাজনীতিতে দুর্দশাগ্রস্ত, বিশ্ব জনমতের প্রতিরোধের মুখে প্রায় বান্ধবহীন নেতানিয়াহুর ইজরায়েল, এই দু'পক্ষের কাছেই সাময়িক হলেও যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন একটু বেশিই ছিল। কিন্তু এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার যে কারণগুলোর কথা এই দু'পক্ষ জানিয়েছিল তার কি হল? তাঁরা কি পেলেন এই যুদ্ধ থেকে?

১) হামাস কি পেল এই যুদ্ধ থেকে?

হামাসের প্রধান লক্ষ তো 'স্বাধীন ফিলিস্তিন'। এই বিশ দফায় সেই স্বাধীন ফিলিস্তিনকে তো স্বীকার করা হয়নি। কোনক্রমে একেবারে শেষের দিকে ১৯ তম দফাতে এসে 'ফিলিস্তিন' শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'গাজা পুনর্গঠন এগিয়ে গেলে এবং ফিলিস্তিনি কতৃপক্ষের (PA) সংস্কার কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে, ফিলিস্তিনিদের স্বনিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বাস্তবসম্মত পথ তৈরি হবে, যা ফিলিস্তিনের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা।' অর্থাৎ সেই ফিলিস্তিন কতৃপক্ষ বা PA, যার তীব্র বিরোধিতা মাধ্যমেই হামাসের জন্ম, তাকেই মেনে নিয়েই হামাসকে এবং গাজার জনগণ কে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে হবে। 'স্বাধীন ফিলিস্তিন' এখনও দূর গ্রহের জিম্মায়। তাই এই গাজা সমঝোতা পত্র যাতে হামাস সম্মতি দিয়েছে তাকে পশ্চাৎপসরণ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে! আর সমঝোতা পত্রের প্রথম দিকের দফাগুলোতে যা বলা হয়েছে তাতে তো হামাসের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। প্রথম দিকের দফা গুলোতে পরিস্কার করে বলা হয়েছে-

বাতাসে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই করা হামাস এবং রাজনীতিতে দুর্দশাগ্রস্ত, বিশ্ব জনমতের প্রতিরোধের মুখে প্রায় বান্ধবহীন নেতানিয়াহুর ইজরায়েল, এই দু'পক্ষের কাছেই সাময়িক হলেও যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন একটু বেশিই ছিল। কিন্তু এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার যে কারণগুলোর কথা এই দু'পক্ষ জানিয়েছিল তার কি হল? তাঁরা কি পেলেন এই যুদ্ধ থেকে?

ক) গাজা ভূখন্ডে হামাসের রাজত্ব থাকবে না।

খ) হামাসকে সমস্ত অস্ত্রসম্ভার জমা করতে হবে। বিনিময়ে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কেউ চাইলে গাজা ছেড়ে চলেও যেতে পারে।

গ) হামাসের অস্ত্রভান্ডার, অস্ত্র কারখানা, কৌশলগত টানেল, সবাই ধ্বংস করা হবে।

ঘ) গাজার প্রশাসনিক কাজে হামাস ও তার সহযোগী সংগঠনগুলিকে কোনভাবেই যুক্ত করা হবে না।

২) এবার দেখি ইজরায়েল কি পেল।

এঁদের প্রধান পরিকল্পনা ছিল গাজায় একজনও ফিলিস্তিনি থাকবে না।

কিন্তু কি হল?

সত্তর হাজার মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব হয়েছে। বহু হাজার মানুষ বেওয়ারিশ লাশ হিসাবে গোনার বাইরে রয়ে গেছেন, পৌনে দু'লক্ষ মানুষ আহত হয়েছেন। তাহলে ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে কতজন মানুষকে দমাতে পারলেন নেতানিয়াহু?

এতো আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করেও ফিলিস্তিনি জীবনকে শেষ করতে পারে নি যুদ্ধবাজরা।

৩) সাধারণ ফিলিস্তিনি মানুষ কী পেলেন?

তাঁদের তো একটাই দাবি - স্বাধীনতা। স্বাধীন, সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র।

আলোচনায় কোথাও সেভাবে ফিলিস্তিন নেই। আছে তার একটা অংশ- গাজা। এবং নিকট ভবিষ্যতে গাজার প্রশাসন বা নিয়ন্ত্রণে জনগণের কোন ভুমিকা থাকবে, এমন কথা কোথাও পাবেন না।

তাহলে দু'বছর ব্যাপী এই একতরফা যুদ্ধের ফল কি ফলল? কারও কি কিছু হল?

হ্যাঁ, হল। গাজা নতুন রূপে উপনিবেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রথম ধাপে পা দিল।

আপাতত গাজাবাসী নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকার অধিকার অর্জন করলেন। আধিকার অর্জন করলেন ত্রাণ সংগ্রহের ( অন্তত দু'হাজার মানুষকে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে ত্রাণ সংগ্রহের অপরাধে!)। কিন্তু এর পর পর যা ঘটতে থাকবে তা প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা আছে সমঝোতা পত্রে -

১) চরমপন্থা ও সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল হিসাবে গাজাকে গড়ে তোলা হবে যাতে এর প্রতিবেশিদের প্রতি কোন হুমকির সুযোগ না থাকে।

২) টেকনোক্রাট ও অরাজনৈতিক সদস্য নিয়ে একটি জনসেবা/পুরসেবা কমিটি তৈরি করা হবে। এর মাথায় থাকবে একটি 'আন্তর্জাতিক অন্তর্বর্তীকালীন সংস্থা - বোর্ড অফ্ পিস'। বলা বহুল্য এটি হবে পুরোদস্তুর রাজনৈতিক সংস্থা। এর মাথায় থাকবেন স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্প। থাকবেপ প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, আরও কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিরা।

৩) গাজার জন্য রচনা করা হবে 'ট্রাম্প অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা'। মধ্যপ্রাচ্য সহ অন্যান্য জাগায় আধুনিক শহর গঠনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একঠি প্যানেল গঠিত হবে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে কর্মসংস্থান, সুযোগ ও আশা সৃষ্টি করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৪) উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সঙ্গে অগ্রাধিকার, শুল্কের হার, প্রবেশাধিকারের ধরণ নিয়ে আলিপ-আলোচনা করে একটি বিশিষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করা হবে।

৫) গঠন করা হবে একটি 'আন্তর্জাতিক স্থিতিশীল বাহিনী'। যুক্তরাষ্ট্রের তত্বাবধানে সৌদি আরব, মিশর ও অন্যান্য আরব দেশগুলির আভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এই বাহিনীকে একটি স্থায়ী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এই বাহিনী অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার সঙ্গে গাজার সীমান্ত নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করবে।

এতো পুরোপুরি অতি আধুনিক এক কর্পোরেট-বান্ধব পরিকল্পনা। আসলে সমগ্র গাজা ভূখন্ড দখল করে 'শান্তিপূর্ণ শোষন' কায়েম করার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর সহযোগীরা। সাজিয়ে-গুছিয়ে লগ্নি পুঁজির কাছে উপহার দেওয়া হবে 'গাজা প্যাকেজ'। অতি তৎপর ট্রাম্প সাহেব এখনই বেরিয়ে পড়ছেন মধ্যপ্রাচ্য সফরে। এ পরিকল্পনায় গাজার মানুষের কথা নেই। নেই তাঁদের রুটি-রুজির কথা, নেই তাঁদের আশা-আকাঙ্খার কথা, নেই তাঁদের অংশগ্রহণের কথাও। সত্যিই নিজের বাড়িতে ফেরা, 'মুক্ত-স্বাধীন-সত্য'কে আলিঙ্গন করে বেঁচে থাকা কি গাজার মানুষের পক্ষে আর কোনদিন সম্ভব হবে ! ❐

অর্থনীতি

# জিএসটির হার কমলেই দাম কমানোর বাধকতা নেই বিক্রেতার

অমিত দাসগুপ্ত

২০১৭ সালের ৩০ জুন-১ জুলাই মধ্যরাতে মোদিজি সংসদের সেন্ট্রাল হলে এক যৌথ সংসদীয় অধিবেশনে পণ্য ও সেবা কর বা জিএসটির 'শুভারম্ভ' ঘোষণা করে ওই নব কলেবরের পরোক্ষ কর বন্দোবস্তকে দেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে অভিহিত করেন। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ১৪/১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-এর মাঝরাতে ভারতের স্বাধীনতার ঘোষনাকে অনুকরণ করার জন্য কোনো এক বিচিত্র বিষয়ের অনুসন্ধানে ছিলেন তিনি, জিএসটির শুভারম্ভকেই তিনি মনে করেছিলেন তেমন এক যুগান্তকারী ঘটনা। তখন এবং পরবর্তীতে বারংবার জিএসটিকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি হিশেবে তুলে ধরেছে সরকার ও শাসক দল। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান ও কর বিশেষজ্ঞ বিজয় কেলকার বলেছিলেন যে, জিএসটি পরিপূর্ণ ভাবে চালু হলে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে ২-২.৫ শতাংশ হারে ও রফতানিকে ১০-১৪ শতাংশ হারে বাড়াবে। সরকার ও বিজেপির ধামাধরারাও ওই বক্তব্যকে আউড়ে গিয়েছেন। কিন্তু মোদিজির 'প্রথম যুগান্তকারী' বিমুদ্রাকরণের ঘোষণা দেশের অসংগঠিত ও ক্ষুদ্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ধাক্কা দিয়েছিল, সেই দুর্দশাতে জিএসটি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছে। জিএসটির ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির

হার যে বাড়েনি তা সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে। জিএসটি ঘোষনার আগের বছরে সেই হার ছিল ৮ শতাংশ,২০১৬-১৭ সালে ৭.১ শতাংশ, জিএসটি ঘোষনার বছর, ২০১৭-১৮ তে ৬.৭ শতাংশ, ২০১৮-১৯-এও তাই। ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২কে কোভিড অতিমারির জন্য বাদ দিয়ে, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪-এ তা ৭.৬ শতাংশ হলেও, ২০২৪-২৫-এ তা কমে ৬.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। তাই ২-২.৫ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির বিশেষ ঘোষণা বছরে দু'কোটি বেকারের কর্মসংস্থান বা কালো টাকা ফিরিয়ে প্রত্যেককে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার মত আরেক বাতেলা বাজিতে পরিণত হয়েছে। রফতানিও মোটেই তত বাড়েনি। কোনো কোনো বছরে কমেওছে। জিএসটির বহুস্তরীয় ও উচ্চ হার নিয়ে সমালোচনা ছিলই। আমেরিকায় ভারতীয় রফতানির উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ফলে দেশের জিডিপিতে ৪ লক্ষাধিক কোটি টাকার আনুমানিক ধাক্কার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই দেশজ চাহিদা বৃদ্ধি ঘটানোর উদ্দেশ্যে জিএসটি কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এবং তা আবার লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে নাটকীয় ভাবে দেশবাসীর জন্য দেওয়ালির উপহার হিশেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যদিও দেওয়ালির তখনও ৯ সপ্তাহ বাকি। তাছাড়া জিএসটির সংশোধন বা হার কমানো বাড়ানো একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়, যা জিএসটি কাউন্সিলের অনুমোদন ব্যতীত সম্ভব নয়। এটাও জানা কথা যে, জিএসটির হার কমানোর ইঙ্গিত করলে সেই হার না কমা পর্যন্ত উপভোক্তা অন্তর্বর্তী কালে অত্যাবশ্যক পণ্য ব্যতীত বিবিধ পণ্য কেনা বন্ধ রাখবে। ফলে তা বিপণীগুলিতে বা গুদামে মজুতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। হয়েছেও তাই। আগস্ট ১৫ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর (পরবর্তীতে জিএসটি সংশোধন কার্যকরী করার দিন) পর্যন্ত কেনাবেচার পরিমাণ কমে গিয়েছে। এসব জান থাকা সত্বেও নাটক ও প্রচারের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতে মোদিজি রাজি নন, তা সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিরীহ নাগরিকের বা সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু, যুদ্ধের বা সেটি বিরতির ব্যখ্যা বা কর হ্রাস যাই হোক না কেন। তাঁর সরকার নাকি দেশের মানুষের কথা ভেবে, করের বোঝা কমিয়ে পণ্যসামগ্রীকে সাধারণের আয়ত্বের মধ্যে আনলো। তাহলে এতদিন এই বোঝা চাপিয়ে জনসাধারণের জীবনযাপনকে কঠিন করে রাখার দরকার কী ছিল? গত ৮ বছর ধরে নাগরিকদের উপর অতিরিক্ত বোঝা বজায় রাখার জন্য দায়ী কে? এটা বলাই যায় যে, নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো (ইংরেজিতে ''বেটার লেট দ্যান নেভার'')। কিন্তু সুস্থ সবল মামাকে অপহরণ করে তাকে কানা করে ফেরত দিয়ে মহৎ সাজার প্রচেষ্টাকে শয়তানিই বলা উচিত।

> যুক্তরাষ্ট্রীয় কর কাঠামোয় জিএসটি কমার ফলে রাজস্ব কমবে। কেন্দ্রের রাজস্ব কমলেও তা পূরণ করার উপায় কেন্দ্রের হাতে রয়েছে। যেমন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিভিডেন্ড এবং তার রিজার্ভ তহবিল থেকে নেওয়া টাকা, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার লভ্যাংশ, যা মোটামুটি কেন্দ্রের অঙ্গুলি হেলনেই নির্ধারিত হয়, বা রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার মালিকানা বিক্রি প্রভৃতি।

যেহেতু জিএসটি পরোক্ষ কর, তাই তা কমলে পণ্যের দাম কমবে এমনটা বলাই যায়, যদি উৎপাদক ও বিক্রেতারা সেই করহ্রাসের সুবিধে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। আন্দাজ করা হচ্ছে যে, জিএসটি কমার ফলে বছরে ৯৩ হাজার কোটি টাকার মত কর কমবে যদি পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ একই থাকে (অবশ্য দাম কমলে বিক্রি বাড়তে পারে)। যেহেতু ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদন আনুমানিক ৩৩১ লক্ষ কোটি টাকা, তাই পণ্য মূল্যের গড় দামের উপরে তার প্রভাব (৯৩ হাজার/৩৩১ লক্ষ)=০.০০২৮ বা ০.২৮ শতাংশ। যদি ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়কে ভিত্তি হিশেবে ধরা হয়, তাহলে সেই প্রভাব (৯৩ হাজার/১৮৫লক্ষ) =০.০০৫ বা ০.৫ শতাংশ। ফলে, অর্থনীতিতে যে মুদ্রাস্ফীতি হত তা ০.৫ শতাংশ অবধি কমতে পারে। যদিও সরকারের অনুমান, জিএসটি হ্রাসের ফলে যে পণ্যমূল্য হ্রাস পাবে তার দরুণ চাহিদা বাড়বে। ফলে জিএসটি হ্রাসের পরিমাণ আনুমানিক ৪৮ হাজার কোটি টাকা হবে।

জিএসটি সংশোধনীকে জিএসটি ২.০ নামে অভিহিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, জিএসটির হারের সংখ্যা কেবল ৩টি করা হয়েছে, ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ। কিন্তু আদতে সর্বমোট জিএসটির হার রয়েছে ৯টি; ০ শতাংশ, ০.২৫ শতাংশ (পালিশ না করা হিরের উপরে), ১ শতাংশ (সস্তা ফ্ল্যাটের উপরে), ১.৫ শতাংশ (পালিস করা হিরে বা মূল্যবান ধাতুর উপরে), ৩ শতাংশ (সোনার উপরে), ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৮ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ (পাপ দ্রব্যের উপরে)। আগে তা ১০টি ছিল (এখনো

রয়েছে, ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত), যেটি উঠে যাবে সেটি হল ২৮ শতাংশ। যাই হোক না কেন জিএসটি হ্রাস পেলে কিছু পণ্যের দাম কিছুটা হলেও কমবে। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে অল্প হলেও ভালো।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কর কাঠামোয় জিএসটি কমার ফলে রাজস্ব কমবে। কেন্দ্রের রাজস্ব কমলেও তা পূরণ করার উপায় কেন্দ্রের হাতে রয়েছে। যেমন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিভিডেন্ড এবং তার রিজার্ভ তহবিল থেকে নেওয়া টাকা, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার লভ্যাংশ, যা মোটামুটি কেন্দ্রের অঙ্গুলি হেলনেই নির্ধারিত হয়, বা রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার মালিকানা বিক্রি প্রভৃতি। কিন্তু রাজ্যগুলির কাছে তেমন কোনো রসদ নেই বললেই চলে। ফলে জিএসটি কমানোর মোদিজির আবদার ও ঘোষণা রাজ্যগুলির উপরে চাপ সৃষ্টি করবে। কিন্তু জিএসটি কমানোর মত এরকম জনপ্রিয় ও জনমোহিনী কর্মসূচিতে না করার উপায় রাজ্যগুলির নেই, এমনকি অবিজেপি রাজ্যগুলিরও। তাই তাদেরকে তেতো বড়ির মত জিএসটি-হ্রাসকে গিলতে হয়েছে। জিএসটির থেকে প্রাপ্য রাজস্ব কমে গেলে রাজ্য সরকারগুলিকে ব্যয় বরাদ্দ কমাতে হবে। হয়তো বা কেন্দ্র সরকারের বদান্যতার মুখাপেক্ষীও হতে হবে। বিগত দিনগুলিতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সমস্ত জনকল্যানমুখি কর্মসূচিকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মোদিজির নাম প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছে। যে রাজ্যে ধারাবাহিক অবিজেপি সরকার আছে অনেক সময়ই তা নিয়ে সংঘাত বেধেছে। জিএসটি থেকে প্রাপ্য হ্রাস সেই সম্ভাবনাকে বাড়াচ্ছে।

জিএসটির সংশোধনের একটি ভয়ঙ্কর দিক হল এটির অসংগঠিত ক্ষেত্র বিরোধী চরিত্র। এমনিতেই জিএসটি অসংগঠিত ক্ষেত্র বিরোধী। কারণ, জিএসটি প্রদানকারী উৎপাদক বা বিক্রেতা জিএসটি দিয়ে কোনো উপকরণ কিনলে সেটির জন্য দেয় জিএসটির সম পরিমাণ ছাড় বা ক্রেডিট পায়। যেহেতু অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যেখানে বিক্রি বাৎসরিক

জিএসটির সংশোধনের একটি ভয়ঙ্কর দিক হল এটির অসংগঠিত ক্ষেত্র বিরোধী চরিত্র। এমনিতেই জিএসটি অসংগঠিত ক্ষেত্র বিরোধী। কারণ, জিএসটি প্রদানকারী উৎপাদক বা বিক্রেতা জিএসটি দিয়ে কোনো উপকরণ কিনলে সেটির জন্য দেয় জিএসটির সম পরিমাণ ছাড় বা ক্রেডিট পায়।

৪০ লক্ষ টাকার কম, কোনো জিএসটি নেই তাই সেক্ষেত্রে ছাড়ের কোনো প্রশ্নই নেই। জিএসটি চালুর আগে সংগঠিত ক্ষেত্রের থেকে কেনা উপকরণে উৎপাদন শুল্ক ও বিক্রয় কর দিতে হত। তাই ওই উপকরণের দাম অসংগঠিত ক্ষেত্রের উপকরণের থেকে বেশি হওয়ার দরুণ উৎপাদক বা বিক্রেতারা অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে তা সংগ্রহ করত। কিন্তু জিএসটি চালু হওয়ার ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্র সেই সুবিধে হারিয়েছিল। জিএসটি ২.০ তে বেশ কিছু উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণে জিএসটির হার ১২ বা ১৮ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশে এসেছে। যেমন ঘি, মাখন, খোয়া, নোনতা ভাজা ভুজি, বিড়ি পাতা, বাই-সাইকেলের যন্ত্রাংশ। ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের যে মূল্য-সুবিধা ছিল তা কমে যাবে। বহু ক্ষেত্রে সংগঠিত ক্ষেত্র অনেক বেশি সুবিধে পাবে কেননা, যে উপকরণ তারা কিনবে তার উপরে প্রদত্ত জিএসটি ছাড়ের সুবিধে থাকার সুবাদে ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য পুঁজি থাকার দরুণ উৎপাদনের ব্যয় সংগঠিত ক্ষেত্রের কম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বীমাকে সকলের কাছে পৌঁছানোর 'মহৎ' উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য ও জীবনবীমার উপরে জিএসটি শূন্য শতাংশ করা হয়েছে। ফলে ওই দুরকমের বীমার প্রিমিয়াম কমবে। যদিও স্বাস্থ্য বীমাকে লভ্য করার অর্থ হল স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণকে উৎসাহ দেওয়া। সেটাতো এই সরকারের উদ্দেশ্য বটেই। সেটাই করা হচ্ছে। তবে ওই বীমাগুলির উপকরণে যে জিএসটি দেওয়া হত তার জন্য ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া যাবে না। তাই জিএসটি তুলে দেওয়ার পরেও ওই সমস্ত বীমার প্রিমিয়াম কতটা কমবে তা বলা মুশকিল।

জিএসটি ২.০-কে যতই বিজ্ঞাপিত করা হোক না কেন, এটি বাস্তবে জিএসটি হারের এক পরিবর্তন ও ২৮ শতাংশ জিএসটি হারের অবলুপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। জিএসটির কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন এতে ঘটানো হয়নি। জিএসটি নিয়ে যে জটিলতার শিকার হয় মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীরা তার কোনো সুরাহা হয়নি। বহু ক্ষেত্রে জিএসটির বিবিধ ফর্ম পূরণ নিয়ে যে কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করতে হয় ওই ছোট ব্যবসায়ীদের তার সমাধান অধরাই রয়ে গেল। এখন দেখা যাক, জিএসটির হার যে সমস্ত ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে সেসব পণ্যের দাম কমায় কিনা উৎপাদক ও বিক্রেতারা, কারণ তাদের তেমন কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। ❐

গল্প

# হেল্পলাইন

সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার

তিন মাস হতে চলল, ভাবল দিয়া।

বারান্দায় বসে রেলিংয়ের গ্রিলে পা তুলতে গিয়ে টের পেল আবার সেই গলার ফাঁস চেপে বসছে। কিছুক্ষণ হল ডাক্তার দেখে গিয়েছে, তখন ছিল না; এখন ফিরে এসেছে। মাস দুয়েক হল এই রকম হচ্ছে। বুকের ভেতরে চাপ, দম আটকে আসতে চায়। ঠিক মতো নিঃশ্বাস নিতে পারে না।

সেই কারণে কিনা বুঝতে পারে না, সারাক্ষণ বিক্ষিপ্ত লাগে।

লকডাউন চলছে কতদিন হয়ে গেল। হাউসিং কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ফ্ল্যাটে কাজের লোক আসতে পারবে না। সুতরাং সারাদিন বাড়ির কাজ থাকে, মেক্যানিকলি করে, করা যায়। কিন্তু চিন্তাভাবনা করতে গেলেই গোল বাধে, মন একেবারে বিকল। সেমেস্টার শেষ করার জন্যে প্রয়োজনীয় লেকচার তৈরি করতে বসেছিল কয়েক দিন। অনলাইনে কোর্স শেষ করবে ভেবেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে। কিছুতেই মন বসাতে পারেনি। এমন কি গল্পের বই পড়তে গিয়েও দেখেছে, তথৈবচ অবস্থা। বিকেলের অবসরে নিজের মতো করে কাটানোর সময় হলেই উপসর্গ তেড়েফুঁড়ে ওঠে।

গোড়ায় ভয় হয়েছিল, অসুখটা করেনি তো? যদিও কী করে সেটা সম্ভব, বোধগম্য হয়নি। কত দিন হয়ে গেল ঘরের চৌকাঠ পেরয়নি। কারো মুখদর্শন নেই। প্রত্যহ বাড়ির কাজের আকাশচুম্বি পর্বতারোহণ করতে করতে দিন ফুরিয়েছে। অবশ্য একা নয়, বৌদির পাশাপাশি কাজ করেছে; তাতে কাজের সংখ্যা কমলেও পরিমাণ অনতিক্রমণীয় থেকে গিয়েছে। কিন্তু জ্বর কাশি সর্দি হাঁচি এমন কি নাক সুড় সুড় নেই; পেট খারাপের চিহ্নমাত্র নেই, সারাক্ষণ খিদে পাচ্ছে দেখে থমকে গিয়েছিল। তাহলে?

কারণ যাই হোক, অস্বস্তি কমার নাম নেই। প্রথমটা বৌদিকে বিব্রত করতে চায়নি। একা হাতে সংসার সামলাচ্ছে; দাদা কনফারেন্সে কোচি গিয়ে আটকে পড়েছে। হঠাৎ লকডাউন ঘোষণার ফলে রাতারাতি প্লেন ট্রেন সব বন্ধ, বেচারা অনেক চেষ্টা করেও ফিরতে পারছে না। এ দিকে, ব্যামো সারার লক্ষণ নেই। শেষে আর থাকতে না পেরে বলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যানি বেসান্ট ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর তিলোত্তমা রায়চৌধুরি অসীম তৎপরতার সঙ্গে ওপরের ফ্ল্যাটের ডাক্তারকে ডাকল।

যথাসময় দীর্ঘাঙ্গ সুদর্শন স্নিগ্ধ চিকিৎসক দরজার ঘন্টার বোতামে আলতো চাপ দিয়ে আগমন বার্তা দিলেন।

যত্ন করেই দেখলেন।

—ইউনিভারসিটি বন্ধ? সারাদিন বাড়িতে? বলে মুখের দিকে তাকালেন।

দিয়া তখন মোটেই কথা বলার মুডে নেই। এক ঝলক তাকিয়ে, বেডকাভারে মনোনিবেশ করে মাথা নেড়ে জবাব সারল।

ডাক্তার বললেন, শরীর তো ঠিক আছে, কোনও গোলমাল নেই...

পাশে বৌদি দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে এক মুহূর্ত বেশি তাকিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়লেন।

— আপনার ফি-টা, বৌদি বলতে শুরু করেছিল, কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, আরে না, না। যা চলছে, তাতে আপনাদের কাছে আসা তো আনন্দের ব্যাপার।

দিয়া অন্যমনস্কভাবে বেডকাভারের নকশা পরীক্ষা করতে করতে সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনল। ভাবতে চেষ্টা করল, এইটুকু সময়ের মধ্যে ডাক্তার বৌদিকে ওর সম্পর্কে কোনও গূঢ় দুঃসংবাদ দেওয়ার অবকাশ পেয়েছে কিনা। তারপর উঠে বারান্দায় এসে বসেছে। দূরের বটগাছে পাতার আড়ালে বসা কোকিলকে ভ্যাঙাতে ভ্যাঙাতে সামনের রাস্তা দিয়ে ময়লা গেঞ্জি, হাফ-প্যান্ট আর ছেঁড়া চটি পরা একটা ছেলে চলে গেল, মাস্ক টাস্কের বালাই নেই। পাড়ার এই কোকিলটা পাগলা গোছের। শীতকালেও মাঝেমাঝে ডাকে। আপাতত ঘোর বর্ষার বিকেলে কু-উ কু-উ করছে। সামনের বাড়ির তিনতলার বারান্দায় মেলা কাপড় হাওয়ায় দুলছে। কিছুক্ষণ আগেও কনে দেখা আলোর আভাস ছিল, এখন নিভে আসছে। সন্ধে নামল বলে।

আজ কী বার যেন? শনিবার তো। এই সময় স্টাফরুম ফাঁকা দেখে রজত এগিয়ে আসে, জানতে চায়, কী

করছ, বাড়ি ফেরার তাড়া আছে কি? ও বেশ জানে, দিয়ার তাড়া থাকে না। জানে দিয়াও। তবু, মুখে হাসি কপালে ভাঁজ ফেলে বলে, দেখতে হবে। তারপরে দু'জনে মিলে নিঃশব্দে বিপুল আমোদের হাসি হাসে। আবার আড় চোখে আসেপাশে তাকিয়ে নিজেদের সামলে নেওয়ারও ভান করে। চোখেমুখে থেকে যায় ভাললাগার আলো, মনে ছলাৎ ছলাৎ আনন্দের ঢেউ।

মুচড়ে উঠল ভেতরটা। মুহূর্তে সুখস্মৃতির জায়গায় মন ভরে উঠল অসহ্য শূন্যতাবোধে আর তারপরেই ধীরেসুস্থে মাথার ওপর এক টন কংক্রিটের চাঙড় এসে বসল। দিয়ার মনে

হল, দেয়ালের মতো সেই কংক্রিট ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, এ জন্মে আর নিস্তার নেই।

ফোন বাজছে।

মা-বাবার আমলের ল্যান্ডলাইন, থেকে গিয়েছে। কাজ করে এখনও। বিশেষ করে দেশময় ঈশ্বরের কাছে আর্ত আবেদনে আকাশে তোলা হাতের মতো মোবাইল ফোনের অধিকাংশ টাওয়ার যখন অতি ঝঞ্ঝার দাপটে গড়াগড়ি যাচ্ছে, তখন সেই পুরাপ্রস্থর যুগের ল্যান্ডলাইন দুই রমণীকে ডায়েল টোন শুনিয়ে মরা হাতির মতো দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে।

ফোনটা ধরব কি, ভাবছে, শুনতে পেল বৌদির হাওয়াই চটির চটর পটর।

তারপর এক দিকের কথা।

—হ্যালো

—এসেছিল

—বলল তো সব ঠিক আছে

—ওই একই রকম

—বুঝতে পারছি না। তুমি ঠিক আছো

তারপর কথা অস্পষ্ট হয়ে গেল, আর শোনা গেল না। দিয়া চেষ্টাও করল না; ওরা নিজেরা কথা বলছে।

চোখের ওপর দিয়ে একটা হাত দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। চওড়া কবজি, লম্বা আঙুল। ডাক্তারের হাত। দিয়া অবাক হয়ে ভাবল, কংক্রিট ভেদ করে ঢুকল কী করে।

পাশের টেবিলে রাখা মোবাইল টিং টিং করে উঠল। মেসেজ।

বোতাম টিপতে ভেসে উঠল বার্তাঃ আমি একজন সত্যিকারে বন্ধু চাই।

তোমার মুণ্ডু, বলে সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করে দিল দিয়া। সত্যিকারের বন্ধু না হাতি! সব বাজে কথা। এরকম মেসেজ মাঝেমাঝেই আসে, একদিন ফোন করে দেখলে হয় কী বলে। ভাবতে ভাবতে আর নিঃশ্বাস নিতে পারে না। হাতও তেমন, একবারটি দর্শন দিয়ে সেই যে পগার পার আর দেখা দেওয়ার নাম নেই। তবু যদি চোখের সামনে একটু ভাসত হয়ত এতটা খারাপ লাগত না।

—দিয়া, ফোন, বৌদির গলা ভেসে এল।

কয়েক মুহূর্ত পরে দাদাভাইয়ের গলার শব্দ।

—কী রে, এখনও ভেটকি?

—হুঁ...

ইদানীং দিয়ার মেজাজ যে মোটেই সুবিধের নেই তা ওরা বিলক্ষণ জানে। এই অবস্থায় দাদার ধারণা ওর মুখটা ভেটকি মাছের মতো হয়ে যায়, সুতরাং ভেটকি। অন্য কেউ বললে হয়ত চটে উঠত। কিন্তু কোনও কারণে দাদাভাই বললে হেসে ফেলে, আজও তাই হল।

— শোন, তোর পরের বেড়ানোটা প্ল্যান করে ফেল।

— দুর বেড়ানো, এই সব কবে শেষ হবে,তার নেই ঠিক।

— মনের জোর করে বেরতে হবেই; আমাদের দেশে প্রতি এক লাখে কত জন মারা যাচ্ছে জানিস? দিয়া এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখেনি। একমাত্র দাদাভাইয়ের পক্ষেই এটা আবিষ্কার করা সম্ভব।

—কত?

— গোটা দেশে গড়ে এক লাখ মানুষের মধ্যে ইনফেকশান হচ্ছে ৭৮ জনের আর মারা যাচ্ছে দু'জন। প্রতি লাখে কিন্তু, বুঝলি তো?

— মাত্র! আর তাই জন্যে সবকিছু বন্ধ করে সবাই বাড়িতে বসে আছে! কেন?

— একটা কারণ, এটা শুরু হয়েছে সচ্ছলদের মধ্যে, ওরাই এনেছে, ওরাই ছড়িয়েছে; বাকি দেশবাসীর তুলনায় ওদের সংখ্যা কম হলেও সরকার মনে করে ওদের গুরুত্ব বেশি, ওদের হচ্ছে মানে, ভীষণ ব্যাপার। অনেকটা ভগবানের অসুখ করার মতো ঘটনা। তাই এত তৎপরতা।

—কিন্তু অন্যদেরও তো হচ্ছে...

—সেটা তো ওই উচ্চবিত্ত বিদেশ-ফেরতাদের থেকে ছড়িয়েছে। তুই দেখবি, ঠিকে কাজের লোকেদের তুলনায় সিকিউরিটি গার্ড বা বাবুদের ড্রাইভারদের অসুখের কথা বেশি শোনা যাচ্ছে।

—আর অন্য কারণটা?

— সরকার আর মানুষের মধ্যে এমনই সুসম্পর্ক যে সরকার কিছু বললে বেশিরভাগ লোক সেটা মানার বদলে অমান্য করে। আইন অমান্য করার রীতিই তো দেশের লোকের আছে। বুদ্ধি আর মেচুওরিটির অভাব থাকলে যা হয়। কোনও কিছুকেই আমরা সিরিয়াসলি যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শিখিনি। তাই দেখবি যেটুকু সাবধানতা নিলে রোগ এড়ানো যেতে পারে, লোকে সেটাও নিচ্ছে না। তাছাড়া, সরকারের ওপর সম্পূর্ণ অনাস্থাও একটা কারণ। মাস্ক টাস্ক পরলে কিচ্ছু হয় না, এই ধারণা অনেকেরই। সরকারের আর পাঁচটা মিথ্যের মতো এটাও বাজে কথাখ অনেকে এ কথা জোর দিয়ে বিশ্বাস করে বলে অসুখের ভয় খুব। তাই হাতপা গুটিয়ে ঘরের মধ্যে কোনও মতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।

—আমি তো বেরতে চাই, কিন্তু কিছুই তো চলছে না...

— সেটাই তো মুসকিল।

দাদাভাই সময় নেয়, তারপরে বলে, দেখ,খুব খারাপ লাগলে হেল্পলাইনে ফোন করে দেখতে পারিস,উপকার হতে পারে।

— হেল্পলাইন?

—কোভিডের জন্যে আজকাল অনেকেরই মন মেজাজ খারাপ, তাদের সাহায্যের জন্যে ফোন নম্বর কাগজে কাগজে দিচ্ছে। কালকের হিন্দুতে বেরিয়েছে,

কলকাতারও একটা নম্বর দেখলাম, মনে হল। ফোন করে দেখতে পারিস। ক্ষতি তো হবে না। বড়জোর একটু বোর হবি।

হিন্দু খবরকাগজটা রোজ আসে, তাই নম্বর বের করা যেতেই পারে। কিন্তু দাদাভাইয়ের গলা শুনে দিয়ার মনে হল না হেল্পলাইনের ওপর বিশাল আস্থা আছে। তবে হ্যাঁ, এই মওকায় অন্যরকম একটা কিছু করার সুযোগ পাবে। তাই দাদার পরামর্শ পুরোপুরি বাতিল করে দিল না। হতে পারে, অচেনা কাউকে বলতে বলতে মাথার গিঁটগুলো খুলে যাবে।

—কিন্তু এটা তো কোভিডের জন্যে নয়...

এক মুহূর্ত চুপ, তারপর সদা আশাবাদী দাদাভাই, বলল, যাইহোক একটা চান্স নিতে ক্ষতি কি।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর ফোন রেখে দিল।

বারান্দায় চায়ের ট্রে নিয়ে বৌদি বসে।

এই সময়টা দু'জনে মিলে কাগজ দেখে, দৈবাৎ চটকদার খবর থাকলে তা নিয়ে কিছুক্ষণ চর্চা করে তাছাড়া সুডোকু শব্দজব্দ তো আছেই।

— জানো, মাঝেমাঝে মনে হয়, বাকি জীবন এই ভাবেই কাটাতে হবে, বলল দিয়া।

তিলোত্তমা কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ওকে একেবারে অবাক করে দিয়ে বলল,আজকাল রজত আর ফোন করে না, না?

মাথা নাড়ল দিয়া, ওর মুখটা ভেটকি থেকে বাংলার পাঁচ হয়েছে, সেটা উন্নতি না অবনতি বলা মুসকিল।

—কত দিন হয়ে গেল, ফোন করেনি।

—সে কি?

দাদাভাই বা বৌদি কখনও ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায় না। দিয়া নিজে থেকে কিছু বললে, সানন্দে শোনে, প্রয়োজনে পরামর্শও দেয়, কিন্তু দু'জনের কেউই আগ বাড়িয়ে কিছু জিগ্যেস করে না। সুতরাং, লকডাউনের আগে থেকেই যে ওদের সম্পর্কে কাঁপুনি লাগছিল, দাদা-বৌদি জানতে পারেনি।

— কলেজ খোলা থাকতেই তো ওদের নীচের ফ্ল্যাটে থাকা শান্তা বলে কারো কথা বলতে শুরু করেছিল। স্মার্ট সুন্দর, আমি তেমন পাত্তা দিইনি। গাধা তো, মানে বুঝিনি। শেষ যে বার কথা হয়েছিল মিন মিন করে একবার আসতে বলেছিলাম। বলল, এখন বাড়ি থেকে কোথাও বেরচ্ছে না, খুব রিস্কি। এখন বুঝতে পারছি, বেরনোর কোনও ইনসেন্টিভ নে । বাড়ির মধ্যেই তো বান্ধবী মজুত।

তিলোত্তমা এক মিনিট সময় পেরতে দিল। তারপর বলল, চন্দ্রকোশ বলল তোর অসুবিধেটা মানসিক, বোরডাম, একাকিত্ব থেকে হতে পারে।

—কে বলল, ইন্সটিটিউটের সাইকোলজিস্ট?

—উঁহু, ডাক্তার।

— কে? যে এসেছিল? দিয়ার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। ওর নাম চন্দ্রকোশ নাকি? তুমি জানলে কী করে?

—কেন, ও তো আগেও এসেছে, মনে নেই? পিসিমার জন্মদিনে; তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বেশিক্ষণ বসেনি বটে, কিন্তু এসেছিল।

বছর তিনেক হল পিসিমা মারা গিয়েছেন; ওদের সঙ্গেই থাকতেন। ওঁর এক পুরনো বয়স্ক ডাক্তার ছিলেন, বাড়িতে এসে দেখে যেতেন। তারপর ছেলেমেয়েদের চাপে স্থায়ীভাবে বিদেশে চলে যাওয়ার আগে এক ছোকরা ডাক্তারকে দিয়ে যান। এমনই কপাল সে আবার ওদের ফ্ল্যাটের কয়েক তলা ওপরে থাকে। দিয়া তাকে ছোকরা ভাবত বটে কিন্তু ছোট তো নয়ই, দিয়ার চেয়ে সামান্য বড় হলেও হতে পারে। তার কথা দাদা-বৌদির কাছে দু'একবার শুনেছে ঠিকই, আমল দেয়নি। বৌদি বলছে, আগে দেখা হয়েছে; কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দিয়া মনে করতে পারল না।

—আসলে, তুই তখন রজতকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলি, খেয়াল করিসনি।

— তাই হবে। তখন কি আর জানতাম আরও একবার রয়েল ডিচ কপালে নাচছে, জানলে অবশ্যই মনোযোগ দিতাম। পরমুহূর্তে গলার স্বর পালটে বলে ওঠে, ইস্, আগেবলবেতো,তাহলে আজই একটা ট্রাই নিতাম।

তারপর বিনা কারণে হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠে বলল, বাবাহ, কতদিন পরে হাসলাম।

হাসির রেশ কাটার কিছুক্ষণ পরে দিয়া বলে উঠল, চার অক্ষরের নাম মেয়েদের যতটা মানায়, ছেলেদের ততটা মানায় না কিন্তু। ভাবো, একটা লোকের নাম মোতিচূড় বা মিহিদানা।

— রাগটা কিন্তু ভাল, মন্তব্য করে তিলোত্তমা।

— খুব ভালো, কোশ গ্রুপের সব রাগই ভাল লাগে। গম্ভীর অথচ মিষ্টি।

—মিষ্টি? তিলোত্তমার চোখে প্রশ্ন।

—করুণ?

— না, করুণও নয়; মালকোশ বা চন্দ্রকোশ গম্ভীর, একটা ছন্দ আছে, সেটা চপল বা লঘু নয়, অনেকটা গজেন্দ্রগমনের মতো।

— রোলিং তো, চাঁদের আলোয় নদীতে বজরা চলার মতো। বা আরও ভাল, আবছা সন্ধেয় জঙ্গলে বাঘ হেঁটে যাওয়ার মতো।

তিলোত্তমা অবাক চোখে দিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। মনে মনে ভাবল,

এত সূক্ষ্ম অনুভূতি, সৃজনশীল মন, এ কষ্ট পাবে না তো পাবে কে ! এর তল পাওয়া যে-সে লোকের কম্ম নয়।

মেঘ কাটতে গিয়েও কাটল না, রজতের কথা কালবৈশাখীর মেঘের চেয়েও ভয়ানক কালো হয়ে মনকে ছেয়ে ফেলল। ওর জীবনে কী যে ঘটে গেল দিয়া তা চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারেনি। শান্তাকে নিয়ে কত ঠাট্টা করেছে আর রজত হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

— তোমার মাথাটা একেবারে গিয়েছে। চেনা হয়েছে বলেই কি সেটা গভীর কিছু? সবে পরিচয়, সেটা তোমার আর আমার এতদিনের সম্পর্কের জায়গা নিতে পারে কখনও?

তাই তো নিল, তেতো কথাগুলো কানের মধ্যে ঝমঝম করে উঠল। অজানা অসুখ, অনিশ্চয়তা লকডাউন, এ সব মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাস, চিন্তাধারাকে এতটাই পালটে দিল। এত মরিয়া করে তুলল। এটা কি ভয় থেকে? যদি আমার অসুখ করে, যদি মরে যাই, তার আগে হাতের কাছে যেটুকু আছে, সেটাকেই আঁকড়ে ধরার প্রবণতা। এত বছরের সম্পর্ক কত সহজে বাতিল করে দিল ! লকডাউন না হলে হয়ত এমন হতো না। তখন প্রত্যহ ইউনিভার্সিটিতে দেখা হওয়া, কথা বলা, এসব অন্য সম্পর্ক তৈরির পথে বাধার কাজ করত কি ? আচ্ছে এ বিষয় পিসিমার ডাক্তার, চাঁদবাবুর কী কোনও বক্তব্য থাকতে পারে? সেটা কী? পরক্ষণে নিজের নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হয়ে উঠল। লোকটাকে তো আদৌ চেনে না, কিছুই জানে না। কোনও ধারণা নেই কী ভাবে, কী খায়, মাথায় কী চলে। তাকে নিয়ে ইডিয়টের মতো এত ভাবার কী আছে।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। বৌদি উঠে পড়ল, মেল পাঠাতে হবে। দিয়া বসে আছে। মাগ্রিবের আজানের শব্দ ভেসে আসছে পেছনের মসজিদ থেকে। শেষ হতেই দুর্গামন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘন্টার শধ ঝরে পড়ল চারদিকে। কোনও লোকে নয়, এতো শব্দ করে একটা যন্ত্র। দিয়ার মোটেই পচ্ছন্দ নয়।

রাতের খাওয়া সবে শেষ হয়েছে, বৌদির দিদি গায়ত্রীদির ফোন এল। তখন সাড়ে ন'টাও বাজেনি। রোজই আসে, তবে আর একটু পরে।

কয়েকটা কথা, তারপর, ঠিক আছে, আমি আসছি, বলে তিলোত্তমা ফোন রেখে দিল।

আপাতত গায়ত্রীদি ওঁদের বাবার কাছে আছেন। বৌদির জামাইবাবু লেকচার দিতে নিউ ইয়র্কে গিয়ে আটকে গিয়েছেন, ছেলে ওখানে পড়ে। মেসোমশাইয়ের শরীর এমনিতে ভাল, কিন্তু একটু আগে হঠাৎ পড়ে গিয়েছেন, কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান ছিল না।

ইন্টারকমে কার্তিককে ফোন করা হল। দিয়াদের গাড়ির চালক, এখানকার কাজের লোকেদের কোয়াটার্সে থাকে।

—টাকা লাগবে? জানতে চায় দিয়া।

—হাজার দশেক হবে?

—হবে।

— কী হল জানিও, আমি জেগে থাকব, বলল দিয়া।

—আচ্ছা, বলে তিলোত্তমা বেরিয়ে গেল।

রাতের বাসন ধুয়ে ফাঁকা ফ্ল্যাটে ঘুরঘুর করতে করতে, হেল্পলাইনের কথা মনে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে পুরনো কাগজের স্তূপের ধারে বসতে দেখা গেল দিয়াকে। আজকের কাগজে নেই। একের পর এক পুরনো কাগজ ঘাঁটা শুরু হল। ঘন্টাখানেক পরে হঠাৎ পাওয়া গেল।

বাকি কাগজ গুছিয়ে, ছোটঘরের আলো নিবিয়ে বেরচ্ছে ফোন এল।

— চিন্তার কিছু নেই রে, হাড় ভাঙেনি, জানাল বৌদি।

—আর অজ্ঞান? জানতে চায় দিয়া।

—ওটা হঠাৎ পড়ে যাওয়ার জন্যে, অন্তত অর্থোপিডিকের তাই ধারণা।

—এসেছিল?

—পাশেই থাকে, মেশিন নিয়ে হাজির।

—যাক, নিশ্চিন্ত। কাল কখন আসছ?

— লাঞ্চের পর কার্তিককে পাঠিয়ে দিস। ওকে ছেড়ে দিয়েছি, একটু পরেই পৌঁছে যাবে।

সকালে ব্রেকফাস্ট করতে বসে একবার হেল্পলাইনের খবরটা মন দিয়ে পড়ে দেখল দিয়া। দিনে ২৪ ঘণ্টা ফোন করা যাবে, সমস্ত কথা গোপন থাকবে, নামধাম কিচ্ছু জিগ্যেস করা হবে না । আর সবচেয়ে বড় কথা এ জন্যে কোনও টাকাপয়সা দিতে হবে না। মন্দ কি! দিয়ার মনটা রোজকার মতো ম্রিয়মাণ নেই দেখে খুশি হয়ে পড়ল। আজকের কাগজটা টেনে নিতে নিতে ভাবল, ডিনারের জন্যে জমাটি কিছু বানালে হয়, বৌদিও এসে যাবে।

চিংড়িমাছ এসেছিল না? ফ্রিজ খুলে দেখল, ঠিক তাই। সেটা আর কিছু কিমা বের করে গলাতে দিল। পরের ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ফটাফট বাড়ির কাজ সেরে রান্নাঘরে ঢুকল। দু'ঘন্টাও গেল না, দিয়াদের ফাঁকা ফ্ল্যাট সুস্বাদু ব্যঞ্জনের সুবাসে ম ম করতে লাগল।

এবার লাঞ্চ বানাতে হবে।

লকডাউনের পর থেকে সবাই দুপুরে আটকে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক হয়েছে, একবেলা ভাত খাবে, দুপুরে হাল্কা কিছু। সেই অভ্যাস অনুযায়ী এক জোড়া স্যান্ডুইচ বানিয়ে স্নানে চলে গেল। সবে গায়ে জল ঢেলেছে, শুনল, প্রথমে ল্যান্ডলাইন বাজছে, তারপর মোবাইল।

যাঃ বাবাহ, আর সময় পেল না।

দিয়া যে সারাক্ষণ বিশেষ একটা ফোনের

অপেক্ষায় থাকে তা মনে মনে অস্বীকার করলেও, চিন্তার গতি দেখে বুঝল আজ নিজের কাছেই ধরা পড়ে গিয়েছে। হ্যাঁ ও ভাবে। সারাক্ষণ রজতের কথা ভাবে, নিজেকে ভুলিয়ে রাখার সময় ভাবে, অবসরেও ভাবে। চিন্তাটা কতটা অনুভূতি কেন্দ্রিক, মানে রজতের প্রেম ভালবাসার কথা আর কতটা মস্তিষ্কজাত সেটা হিসেব করে দেখেনি। তবে এটা বিলক্ষণ টের পায়, কী ঘটেছে তার চেয়ে কী কারণে ঘটেছে, আজকাল তা নিয়ে মনে মনে বেশি চর্চা করছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে রজত সম্পর্কে ওর যে ধারণা, তা একটু একটু করে হলেও বদলাচ্ছে। ওই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করে বসছে, তাহলে কি আমি যা ভেবেছিলাম, সেটা ঠিক নয়। চিনতে ভুল হয়েছিল?

স্নান শেষে বেরিয়ে দেখল বৌদির ফোন।

—কী হল?

—কেলেঙ্কারি হয়েছে। আজ সকালে সাততলার ফ্ল্যাটে কোভিড ধরা পড়েছে, গোটা বাড়ি সীল করে দিয়েছে।

—মানে?

— মানে আর কী, অন্তত পনেরো দিন আটকে গেলাম।

—যা-আ-আ! কী হবে? আমি যে জমিয়ে রান্না করেছি।

— কী আর হবে, তুই মজা করে খাবি, ভালই তো। তবে তোকে একলা থাকতে হবে, এটাই যা চিন্তার।

—মেসোমশাই কেমন আছেন?

— না, বাবা ঠিক আছে। কিন্তু তুই? তুই ঠিক থাকবি তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে একদম চিন্তা করো না।

সাহসী গলায় বলল বটে কিন্তু ধাক্কা একটা লেগেছে, আশা ধূলিসাৎ হওয়ার ধাক্কা। সকালের ফুরফুরে ভাব নেই। খাওয়ার টেবিলে থরে থরে সাজানো পরিশ্রমের প্রমাণের দিকে নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে স্যান্ডউইচ আর কফি নিয়ে বসল।

শ্রাবণের দুপুর। অনেকক্ষণ হল মেঘ জমছে, ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এল। বারান্দা পেরিয়ে চোখ মেলে দিয়েছে দিয়া। কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। শ্রাবণ মাসে বিদ্যুৎ! আর তখনই হেল্পলাইনের কথা মনে পড়ল। খারাপ লাগা একটু যেন পিছিয়ে গেল। আবেগের এই তো মজা, তুঙ্গে ওঠে, কিন্তু বেশিক্ষণ টিকতে পারে না, নেমে আসতে হয়। আচ্ছা, এই হঠাৎ হওয়াকে নিজের আওতায় আনা যায় না, নিজের ইচ্ছেমতো ভাল লাগানো খারাপ লাগানো যায় না? ভাবল ও।

নম্বর ডায়াল করল। চব্বিশ ঘন্টা ফোনের ওদিকে বসা লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা আঁচে বসানো দুধের মতো ফুলে উঠছে। পনেরো সেকেন্ড ধরে পিক পিক করে শ্মশানের নৈঃশধ নেমে এল কানের মধ্যে। কলকাতার ফোন, এ রকম হয়েই থাকে। রি-ডায়েল বোতাম টিপল। আবার সেই পিক পিক আর নৈঃশধ। আচ্ছা, নম্বরটা ভুল করিনি তো! মন দিয়ে কাগজে ছাপা নম্বর দেখল। তারপর একটা চিরকুটে লিখে নিয়ে ফের ডায়েল করল। যাঃ বাবাহ্, এ বারে পিক পিকওহলনা।

আধ ঘন্টা ধস্তাধস্তির পর দিয়া উঠে পড়ল। একটু পরে আবার চেষ্টা করব; হতে পারে ওরা লাঞ্চে গিয়েছে। কিন্তু ২৪ ঘন্টা লেখা আছে যে... ঘন্টা দুয়েক পরে আবার ফোনের ধারে ফিরে এল।

দু'বার বাজতেই কে যেন ফোন তুলল।

উৎসাহে চনমন করে দিয়া হ্যালো বলেছে, ও পাশ থেকে এক মহিলার গলা বলে উঠল, ওয়েলকাম টু সাউন্ড মাইন্ড। ফর ইংলিশ প্রেস ওয়ান, হিন্দি কে লিয়ে দো দাবায়েঁ, বাংলার জন্যে তিন প্রেস করুন।

এটা হেল্পলাইন, না ইলেক্ট্রিক কোম্পানি। দমে গিয়ে তিন টিপল দিয়া।

আবার গলা বলে উঠল, আপনার অসুবিধে যদি অনেক দিন ধরে হয়ে থাকে তাহলে এক প্রেস করুন, আপনার অসুবিধে সম্প্রতি হলে দুই প্রেস করুন।

কী করি, ভাবল একটু তারপর দুই টিপে মনে হল এ বারে হয়ত কেউ আসবে।

নাহ্, গলার আরও জিজ্ঞাস্য আছে।

আপনার বয়স পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে হলে এক প্রেস করুন, পনেরো থেকে পঁচিশ হলে দুই প্রেস করুন, পঁচিশ থেকে চল্লিশ হলে তিন প্রেস করুন, চল্লিশ থেকে...

দুর্গাবাড়ির মন্দিরের কাঁসরঘন্টার কথা মনে পড়ে দিয়ার, তবু ফোন ধরে থাকে। দেখি না, কত বয়স পর্যন্ত চলে।

শুনতে পেল গলা নিজের মতো বলে চলেছে, ষাট থেকে পঁচাত্তর, পঁচাত্তর থেকে নব্বই।

গলা থেমে গেল। কোনও মতে তিন টিপে হো হো করে হেসে ফেলল দিয়া।

গলা ফিরল ;আপনি আমাদের ফোন করাতে আমরা বাধিত। এই কোভিডের সময়, এমনিতেই সারা দেশ বড় সমস্যার মোকাবিলা করছে। আপনার সমস্যাগুলো সারা দেশের এতজন মানুষের সমস্যার তুলনায় কী আর বড়। তবু সমস্যা হয়েছে আর তার উপায় বের করতেই আমরা আছি। এই মুহূর্তে আমাদের সব কর্মীরা ব্যস্ত আছে, আপনি লাইনটা হোল্ড করুন, তারা এখুনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে তৈরি হয়ে যাবে।

ভাষণ শুনে দিয়ার হাসি থেমে গেল। এ কী বাংলা? সমস্যার উপায় আবার কী! সারা জীবন সমস্যার সমাধান শুনে এসেছে; এটা তো বাংলা নয়। তারপর বুঝল, এটা হিন্দির

আক্ষরিক অনুবাদ। এমন কেউ করেছে, যার বাংলার সামান্যতম জ্ঞান নেই। আর, সব কর্মীরা আবার কী ? সব হলে যে কর্মী হয়, ওরা তাও জানে না। এই রকম বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে পরামর্শ দেবে! তবু হাল ছাড়ে না ও।

প্রায় মিনিট সাতেক পরে এক মহিলার ঘুমন্ত গলা শুনতে পেল, নমস্কার, সাউন্ড মাইন্ডে স্বাগত।

আমি স্বেতা বলছি, আপনাকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারি।

— আমার কয়েক মাস ধরে ডিপ্রেসড লাগছে। কয়েক সেকেন্ড সব চুপ। দিয়া অধৈর্য হয়ে হ্যালো বলে ওঠে।

— হ্যাঁ ম্যাডাম, বলুন।

— ঐ যে বললাম, কয়েক মাস ধরে ডিপ্রেসড লাগছে।

— এটা আপনার কেন হচ্ছে ?

— সেটা জানতে পারলে তো হয়েই যেত।

— আচ্ছা। এ রকম হলে কী মনে হয় ?

— মনে তো কিছুই হয় না, সেটাই তো সমস্যা।

—হ্যাঁ, ঠিক। তখন কি আপনার আত্মহত্যা করার কথা মনে হয় ?

—খামোখা আত্মহত্যার ইচ্ছে কেন ?

— আত্মহত্যা করার আগে আপনার চিন্তাভাবনা করা খুব জরুরি। আপনি যদি এমন কিছু করবেন তো আপনার কাছের লোকেরা কত দুঃখে থাকবেন তা বোঝা জরুরি। আপনার পরিবারের লোক আপনার বন্ধুরা। এমন একটা ঝুঁকি নেওয়ার আগে একবার অন্তত তাদের কথা ভেবে দেখা খুব জরুরি।

— আচ্ছা, জরুরির কোনও প্রতিশধ আপনার জানা নেই ?

—হ্যাঁ, প্রতিবেশিদের কথা ভাবা জরুরি। তারাও তো আপনার পাশে আছে। আপনি তাদের সাহায্য নিতে পারে।

— অবশ্যই। আবার নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমতেও পারে... দিয়া এবার রীতিমতো মজা পেয়েছে। ভাবল এর কী জবাব আসবে। শুনল

— শুধু নাকে নয়, মুখেও দিয়া থ। জীবনে কাউকে মুখে সর্ষের তেল দেওয়ার কথা শোনেনি। শুনল গলা বলে চলেছে

—ভাল করে নাকে আর মুখে মাস্ক পরে তবেই বাড়ি থেকে বেরবেন। খেয়াল রাখবেন আপনার থেকে দ্বিতীয় লোক যেন দু'কিলোমিটার দূরে থাকে।

— ওটা দু'মিটার, কিলোমিটার নয়, বলল দিয়া।

হাসি গুল গুল করে উঠছে। আর কথা না বাড়িয়ে ফোন ছেড়ে দিল। এ রকম হেল্পলাইন কার কাজে লাগে, অবাক হয়ে ভাবল । এর চেয়ে নিজেকে সাহায্য করতে পারলে বেশি উপকার হবে। মনের খোঁজ নিয়ে বুঝল, আগের মতো বিকট লাগছে না। রজতের কথা মনে হল বটে, কিন্তু কেমন আবছা ভাবে। খারাপ লাগল, কিন্তু কই, আগের মতো তীব্র যন্ত্রণা হল না তো! চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে গিয়ে বেশ একটা রাজা রাজা ভাব হল; মনার্ক অফ অল আই সারভে, গোছের ।

যথাসময় দাদাভাই আর বৌদির ফোন এল। দাদা অবাক আর খুশি হয়ে বলল, তোকে কিন্তু আর ভেটকি শোনাচ্ছে না রে।

—আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি। হেল্পলাইনে ফোন করেছিলাম।

আচ্ছা, ওরা তাহলে হেল্পফুল, বল।

দিয়া বিশদ বর্ণনা দিতে শুরু করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভাইবোনের হাসির শব্দে ফোন লাইন কেঁপে কেঁপে উঠল।

দু'দিন কাটল। ইতিমধ্যে, ক্লাসের পড়া শুরু করে দিয়েছে দিয়া। বাকি সময় একটা মোটা উপন্যাস নিয়ে বারান্দায় বসে। টের পেল উত্তরোত্তর রজতের মুখটা আরও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন রাতে, খাবার গরম করছে, দরজার বেল বাজল। কে ভাই, মনে মনে প্রশ্ন করল। আজ তো পুরো লকডাউন। তাহলে ? দরজার ফুটোয় চোখ রেখে হাঁ। এ তো চাঁদবাবু, মানে ডাক্তার। চিনি ফুরিয়েছে, চাইতে এসেছে ?

এক গাল হাসি নিয়ে দরজা খুলল দিয়া। দরজার সামনে ডাক্তার স্ট্যাচু, অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিয়া হাসলে পৃথিবী থমকে যায়, সে কথা দিয়া তো আর জানে না।

— ভেতরে আসুন, উচ্ছল গলায় বলে ওঠে। তারপরেই, খেয়ে এসেছেন ?

—না, মানে, ডঃ চন্দ্রকোশ চৌধুরী, এম ডি, আমতা আমতা করে।

— আসলে দু'জনের জন্যে অনেক রান্না করে ফেলেছিলাম, তখন তো আর জানি না বৌদি আটকে যাবেখ

— জানি, আপনাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। আমাকে ফোন করে খোঁজ রাখতে বলেছিলেন। পর পর নাইট ডিউটি পড়ে গিয়েছিল বলে আগে আসতে পারিনি ।

— বৌদি এটা ঠিক করেনি। আপনার এত ব্যস্ততা, দায়িত্ব, এর মধ্যে আবার আমার বোঝা ।

—আসতে চেয়েছি, খুব, কিন্তু.....

দুম করে আলো চলে গেল। অন্ধকার ঘরে প্রায় অপরিচিত দু'জন নিঃশধে দাঁড়িয়ে। হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়, কিন্তু শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার ফরমান জারি হয়েছে বিশ্বজুড়ে।

মোমবাতি জ্বালিয়ে দুটো প্লেটে ভাত বাড়ল দিয়া। রজতের মুখটা আর মনে পড়ল না। ❐

# প্রতিদিন মনে পড়বে

মশিউল আলম

বারডেম হাসপাতালের পঞ্চম তলার প্রশস্ত করিডরে ভুতুড়ে আলোছায়া। কোথাও কেউ নেই। শুধু করোনারি কেয়ার ইউনিটের দরজার কাছে একটা টুলে বসে ঝিমাচ্ছে গাঢ় সবুজ ইউনিফর্ম পরা এক লোক।

জোড়া হাঁটুর মাঝখানে দুই হাত, জড়সড়, যেন শীত লাগছে। মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে; তন্দ্রার আবেশে ঢুলছে।

আমি কাছে গিয়ে গলা খাঁকরে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। কিন্তু লাভ হলো না, সে একইভাবে ঢুলতে থাকল। তার কাঁধের ওপর আলতো করে একটা হাত রাখলাম। এবার সে নড়েচড়ে উঠে বিকট এক হাই তুলে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'ভাই, একটু ভেতরে যাব।'

'পাকাঝি দকু মেন্ত', ঘুমজড়ানো ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় বলল সে, খাঁটি রুশ ভাষায় পরিচয়পত্র দেখা। অনুনয়ের সুরে বললাম, 'নাই, হারায়ে ফেলেছি।'

সে আবার চোখ বুজতে বুজতে বলল, 'তাইলে বাড়ি যা।'

হাত জোড় করে কাকুতিমিনতি করতে লাগলাম। সে বন্ধ চোখেই নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'নি মিশাই, ইদি

দামোই।' বিরক্ত করিস না, বাড়ি যা।

হঠাৎ আমার খুব রাগ হলো, দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, 'এখ্ ব্লিয়াদ! বাখতিওর নাশোল্সা!'শালা দারোয়ান আইছে!

গালি খেয়ে চোখ খুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আরে, আমি কিসের বাখতিওর? আসল বাখতিওর? তো গর্বাচভ।' চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লেকচার দিতে লাগলাম স্তালিন থেকে ব্রেঝনেভ পর্যন্ত সব জেনারেল সেক্রেটারিকে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ডিকটেটর বলে নিন্দামন্দ করে চললাম। শেষে বললাম, এ দেশের প্রত্যেকটা দারোয়ান একেকজন স্তালিন; ঢুকতে দেবে কি দেবে না, সেটা তার মর্জি। এই জন্যই দেশটা রসাতলে যাচ্ছে।

লোকটার তবু ঘুম ছোটে না, আধবোজা চোখে বলল, 'বকবক করিস না, বাড়ি যা।' পকেট থেকে ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। কিন্তু লোকটা দেখল না, তার চোখ বন্ধ। গলা খাঁকরে বললাম, 'সিগারেট চলবে?'

লোকটা বন্ধ চোখেই বলল, 'কুরিৎ নিলজা, এতা গোসপিতাল।' ধূমপান নিষেধ, এটা হাসপাতাল।

'ভালো কথা। তাহলে ভোদকা?'

আমি আমার কাঁধের ব্যাগ থেকে ভোদকার বোতল বের করলাম। লোকটা চোখ খুলে তাকাল। আবছা আঁধারে চকচক করছে তার তৃষ্ণার্ত দুই চোখ। হঠাৎ করোনারি কেয়ার ইউনিটের দরজা খুলে গেল। আমি জুতা খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দেখি সামনে রমনা লেক, পাড়ের গাছেরা লেকের পানিতে নিজেদের মুখ দেখারচেষ্টা করছে, কিন্তু পানির তিরতিরে ঢেউয়ে গাছেদের ছবিগুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

'কী রে ববি, রাতে ঘুমাসনি?'

পিছনে ফিরে দেখি দ্বিজেন কাকা মুখে স্নেহভরা হাসি, রুপালি চুল বাতাসে উড়ছে।

'কাকা, আপনার চুল বড় হয়েছে।'

তিনি কাছে এসে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'রাতে ঘুম হয়নি?'

বললাম, 'বায়ুচড়াটা বেড়েছে।'

কাকা শব্দ করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'চল হাঁটি।' আমরা রমনা লেকের পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। একটু পরই কাকা বললেন, 'তুই বদরুদ্দীন উমরকে জিজ্ঞেস করলি না কেন কোটি কোটি মানুষের প্রাণ যদি হয় বিপ্লবের মাশুল, তাহলে বিপ্লবের দরকার কী?'

'কাকা, আপনি কিন্তু বুর্জোয়াদের মতো কথা বলছেন', আমি বললাম, 'ক্যাপিটালিস্ট প্রোপাগান্ডা মেশিন স্তালিনকে ডিমোনাইজ করতে এ রকম কথা গোড়া থেকেই বলে আসছে। কিন্তু ক্যাপিটালিজমের মাশুল তো সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মাশুলের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি।'

'ক্যাপিটালিজম আসলে কোনো ইজম না, স্পন্টেনিয়াসলি গড়ে ওঠা একটা সিস্টেম। হিউম্যান নেচারের সাথে ক্যাপিটালিজম খুব খাপ খায়। আল্টিমেটলি, মানুষ তো একটা প্রাণী, হিউম্যান এনিমেল। তার বেসিক ইন্সটিংক্ট হলো নিজেকে তুষ্ট করা। সেটা করতে যদি তার অন্য কাউকে ঠকাতে হয়, অন্যেরটা কেড়ে নিতে হয়, এমনকি অন্যকে মেরেও ফেলতে হয়, তাহলে সে তা-ই করার চেষ্টা করবে।'

'কাকা, আমরা কিন্তু এখন আর ওয়াইল্ড কন্ডিশনে বাস করছি না। আমরা সভ্যতা গড়েছি, সারভাইবাল অব দ্য ফিটেস্ট জঙ্গলের নিয়ম, মানুষের সমাজে ওটা চলবে না।'

'শোন, লেনিনের সহযোদ্ধাদের মধ্যে স্তালিন ওয়াজ দ্য ফিটেস্ট পার্টি লিডার। তাই তার হাতে কিরোভ মরেছে, বুখারিন মরেছে, কামিনিয়েভ মরেছে, জিনোভিয়েভ মরেছে, সব মরে শেষ হয়ে গেছে। এমনকি ত্রৎস্কি দেশ ছেড়ে পালিয়ে সুদূর মেক্সিকো গিয়েও রক্ষা

পায়নি। অক্টোবর বিপ্লবের পর গ্রামে গ্রামে যে সোভিয়েতগুলো গঠন করা হয়েছিল, সেগুলোর নেতা হয়েছিল কারা, বলতে পারিস? সবচেয়ে দাপুটে লোকেরা; মদ্যপ, মারকুটে, বাটপার টাইপের লোকজন। কুলাকদের মারার জন্য, হোয়াইটদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ওদেরই বেশি দরকার ছিল। দে ওয়ার দ্য ফিটেস্ট...।'

আকাশ-ছাওয়া গাছের সারির পাশ দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছি। দ্বিজেন শর্মার কথা থামছে না 'এই যে দুনিয়াজুড়ে অক্টোবর বিপ্লবের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজনচলছে,সবাই কিন্তু সেলিব্রেশনের মুডেই আছে। উৎসব উদ্‌যাপনেরব্যাপারতো অবশ্যই। কিন্তুর‍্যাশনালি একটু চিন্তা করাও তো দরকার। ভেবে দেখা দরকার সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সমস্যাগুলো কী ছিল, কেন কিছুই টিকল না। টিকল না যে, না টেকাই কি অনিবার্য ছিল? এ রকম ব্যবস্থা কি আদৌ টেকার নয়? কিন্তু এসব কেউ ভাবছে না। সবাই শুধু নস্টালজিয়ায় ভুগছে।'

'আপনার নস্টালজিয়া হয় না?'

'খুব হয়। তুই মস্কো ছিলি ছয় বছর, আর আমি ছিলাম বিশ বছর। ভাবতে পারিস, একজীবনে বিশ বছর মানে কী?'

'সোভিয়েত ইউনিয়ন যে আর নাই, মানে একদমই নাই, এ জন্য আপনার খারাপ লাগে না?'

'শোন্,রাশিয়ার লোকজন এখন একটা কথা বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে, এই কথা ভেবে যে দুঃখ পায় না, তার হৃৎপিণ্ড নাই। আর যে ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার জোড়া লাগানো সম্ভব, তার মগজ নাই।' কেউ জোরে হেসে উঠল, মানে একদম অট্টহাসি। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, একটু দূরে একটা গাছের নিচে ঘাসের ওপর উবু হয়ে বসে আছেন খালি গায়ে লুঙ্গি পরা এক বুড়ো মানুষ। তাঁর এক হাতে একটা বেতের ডালা, আমাদের দিকে চেয়ে হাসছেন তিনি। আমরা পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনিও ডালাটা হাতে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর বুকের খাঁচাটা খুব স্পষ্ট, পাঁজরের হাড়গুলো গোনা যাচ্ছে।

তিনি বুঝতে পারলেন, আমাদের চোখেমুখে জিজ্ঞাসা। বললেন, 'আমি রামভদ্রপুরের ভূমিহীন খেতমজুর নাইকি হেমব্রম। ডাক্তার আবদুল কাদের চৌধুরীর সঙ্গে আন্দামানে কয়েদ খেটেছিলাম। ইগোর কুজমিচ আমার সহযোদ্ধা।'

'ইগোর কুজমিচ কে রে, ববি?'

'লিগাচভ।'

তিড়িংবিড়িং লেজ নাচিয়ে উদয় হলো এক কাঠবিড়ালি। আমাদের থেকে হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল, লেজ উঁচিয়ে একদম স্থির, অপলক চোখে চেয়ে রইল আমাদের মুখের দিকে। নাইকি হেমব্রম তাঁর হাতের ডালাটা কাঠবিড়ালির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। কাঠবিড়ালি পরপর কয়েকটা লাফ মেরে তাঁর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল, তিনি কোমর হেলিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে ওটার মুখের সামনে ডালাটা ধরলেন। কাঠবিড়ালি ছোট্ট একটা লাফ মেরে উঠে পড়ল ডালায়।

নাইকি হেমব্রম হেসে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন, বিদায় জানানোর ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ালেন এবং কাঠবিড়ালিসুদ্ধ ডালাটা এক কাঁধে নিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে পুবদিকে হেঁটে চলে গেলেন।

হঠাৎ টুংটাং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। আমরা পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম লেকের ওই পারে, পার্কের দেয়াল পেরিয়ে যে রাস্তাটা মৎস্য ভবনের দিকে গেছে, সেদিক দিয়ে সবুজ রঙের একটা ট্রাম যাচ্ছে।

আমি বললাম, 'কাকা, লিগাচভ মনে করেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন অনিবার্য ছিল না।'

কাকা বললেন, 'একবার মেট্রোতে লিগাচভের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখন তিনি পার্টি থেকে বেরিয়ে গেছেন। শুনেছি তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি ছিল না, চলাফেরা করতেন মেট্রোতে, বাসে, ট্রামে। সৎ লোক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর মতো সৎ নেতা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিতে নিশ্চয়ই বিরল ছিল।

অধিকাংশই ছিল শেভারনাদজে-ইয়েলৎসিনদের মতো অসৎ।'

'আর গর্বাচভ? গর্বাচভ কি সৎ লোক?'

'মনে হয় অসৎ না। কিন্তু গ্লাসনস্ত-পিরিস্ত্রোইকা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকতে পারে,সেটা বেচারা বুঝতে পারেনি।'

'আপনি বুঝতে পেরেছিলেন?'

'না। আমরাও পারিনি। কেউই বুঝতে পারেনি। রোন্যাল্ড রিগ্যান আর তার সিআইএও না। আমরা ভেবেছিলাম, সমাজতন্ত্রের ভুলত্রুটিগুলো শুধরানো হবে, আমলাতন্ত্রের আবর্জনা দূর হবে, স্ট্যাগনেশন কেটে যাবে।'

ভীষণ লম্বা-চওড়া মধ্যবয়সী এক লোক আমাদের পাশ কেটে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি, আমি যদি ভুল না শুনে থাকি, আপনারা স্ট্যাগনেশন নিয়ে আলাপ করছিলেন?' কথাগুলো সে বলল স্পষ্ট বাংলায়, কিন্তু কোনো বাঙালি এভাবে বাংলা বলে না। লোকটা ভীষণ ফরসা, তার চুল আলকাতরার মতো কালো, চোখের মণি বিড়ালের মতো কটা। নিশ্চয়ই বিদেশি। ভাদ্র মাসের গরমেও তার পরনে কালো স্যুট-টাই। ডান হাতে সোনালি হাতলওয়ালা ওয়াকিং স্টিক।

'হ্যাঁ, আমরা সোভিয়েত সোশ্যালিজমের স্ট্যাগনেশনের কথা বলছিলাম।'

'কী? কী বললেন? সোভিয়েত সোশ্যালিজম? ফুহ্!'

লোকটা এমন তাচ্ছিল্যের সুরে কথাগুলো বলল যে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বললাম, 'কে আপনি? কোত্থেকে এসেছেন?'

'ভোলান্দ। নামটা নিশ্চয়ই আপনাদের পরিচিত?'

আমি দ্বিজেন শর্মার দিকে চেয়ে বললাম, 'কাকা, শুনেছেন ভদ্রলোক কী বলে?'

কাকা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'শুনেছি, চল যাই।' আমরা লোকটাকে এড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সে আমাদের পিছু পিছু আসতে আসতে বলল, 'কাল বিকেলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসবেন। ওখানে দারুণ ম্যাজিক দেখানো হবে।'

আমি কাকার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'কাকা, লোকটা চিওর্নি মাগ, ব্ল্যাক ম্যাজিকের ওস্তাদ! মনে নাই, মস্কোর ভেরিয়েতে থিয়েটারে কী কাণ্ড ঘটিয়েছিল?'

'ইনসোমনিয়ায় তোর মাথাটা একদম গেছে। বাসায় যা, ঘুমা।'

'মিস্টার শর্মা, ঘুম প্রয়োজন আপনার।' পেছন থেকে তির্যক সুরে বলে উঠল লোকটা।

কাকা ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আমরা লেকের ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে হেঁটে চললাম। কিছু দূর এগোনোর পর পেছন ফিরে তাকালাম আমি। লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না। একটু পর লাল টাইলের পায়ে চলা চিকন পথটা বেঁকে গিয়ে পুবমুখী হলো, আমরা পুবদিকে এগিয়ে চললাম। আমাদের ডান পাশে লেকটাও পুবদিকে মোড় নিয়েছে। এখানে লেকের পানি উজ্জ্বল, পাড়ের গাছগুলো দূরে দূরে, তাদের ছায়া লেকের পানিতে পড়েনি।

কিছু দূর এগোনোর পর আবার সেই লোক। লেকের কিনারে একটা শানের বেঞ্চে বসে আছে। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে লেকের দিকে। বেঞ্চটা আমাদের চলার পথের ধার ঘেঁষেই। আমাদের যেতে হবে তার পিঠের একদম কাছ দিয়ে। মনে হয় সে জন্যই তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন কাকার ভ্রু বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল। কিন্তু আমরা হাঁটা থামালাম না। চুপচাপ লোকটাকে অতিক্রম করে গেলাম। সে নিশ্চয়ই টের পেল, কিন্তু যেমন স্থির হয়ে বসে ছিল সেভাবেই বসে রইল।

একটু পর আমাদের পথটা ফুরিয়ে গেল। রমনা লেকও এখানে এসে শেষ হয়েছে। কোণে একটা শিউলিগাছ দাঁড়িয়ে আছে, তার গোড়ার কাছে শানবাঁধানো বেঞ্চ দেখে কাকা বললেন, 'চল ওখানে একটু বসি।'

আমরা লেকের দিকে মুখ করে পাশাপাশি বসলাম। লেকের ওপর খোলা আকাশটা দুধের মতো ফরসা হয়ে উঠল। শিউলিগাছ থেকে টুপ টুপ করে ফুল ঝরে পড়তে লাগল আমাদের গায়ে, মাথায়, পায়ের কাছে। আমি ফুল কুড়াতে শুরু করব বলে হাত বাড়াতেই কাকা বললেন, 'থাক থাক, ধরিস না। হাতের ছোঁয়া পেলেই ফুলগুলো মিইয়ে যাবে। বসে থাক চুপচাপ। বোঁটা থেকে ফুল খসে পড়ার শধ শুনতে পাবি।'

আমি সুবোধ বালকের মতো চুপচাপ বসে রইলাম। সত্যিই বোঁটা থেকে ফুল খসার শধ কানে বাজতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আশপাশের মাটি অজস্র শিউলি ফুলে ঢাকা পড়ে গেল। অপূর্ব মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠল চারপাশ। কাকা চুপচাপ লেকের পানির দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর মুখমণ্ডল আকাশের মতো ফরসা হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ লক্ষ করলাম, শিউলিগাছটা থেকে পেঁজা তুলোর মতো তুষার ঝরতে শুরু করেছে। লেকের ওপরের আকাশ থেকে ভেসে ভেসে নামছে রাশি রাশি তুলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তুষারে ছেয়ে গেল রমনা উদ্যানের সমস্ত গাছপালা। মনে হলো, গাছগুলো তুলো দিয়ে বানানো। আমাদের হাঁটু পর্যন্ত জমে উঠল তুষার। লাল টাইল বিছানো যে পায়ে চলা পথ দিয়ে আমরা হেঁটে এসে এখানে বসেছি, সেই পথ এখন শীতের মস্কোর লেনিনস্কি বার্চবনের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া পথ। খুব ঘন হয়ে তুষার ঝরছে। কাকার রুপালি চুলভরা মাথাটা এখন এক তুলোর বল।

'কাকা, আপনার ঠান্ডা লেগে যাবে। চলেন বাসায় যাই।'

'বীরেন চট্টোপাধ্যায় নিউমোনিয়ায় মরেনি, জানিস তো?'

'বারডেমের আইসিইউ নাকি আরও ভয়ংকর সব জীবাণুর বাসা। সব জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট।'

'বীরেন চট্টোপাধ্যায় যে উদ্দেশ্যে মস্কো এসেছিলেন, সেই একই উদ্দেশ্যে আমিও এসেছিলাম। তাঁর দুর্ভাগ্য, স্তালিন তাঁকে মেরে ফেলেছে, আমার সৌভাগ্য গর্বাচভ আমাকে মারবে না।'

'মারবে না মানে? গর্বাচভ তো সমাজতন্ত্রেরই বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। প্রগ্রেস-রাদুগায় আপনারা যাঁরা আছেন, সব্বাইকে পথে বসিয়ে দেবে। টের পাচ্ছেন না?'

'তাই বলছিস? তাহলে ননীদাকে তো আর বাঁচানোই যাবে না।'

'শুধু আপনার ননীদা? গর্বাচভ যেদিন টিভিতে শেষ ভাষণটা দেবে, যেই মুহূর্তে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সবচেয়ে বড় দেশটা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে কত হাজার মানুষ সুইসাইড করবে, কল্পনা

করতে পারেন?'

'দরকার নাই, দরকার নাই। সুইসাইড করার দরকার নাই। এক সোভিয়েত এক্সপেরিমেন্টই সভ্যতার শেষ কথা না। মানুষের সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার-শোষণ-বঞ্চনা দূর করার চেষ্টা চলতেই থাকবে। তুই কেন ভাবিস, মানবজাতিকে এসব থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব শুধু আমাদের একার?'

বরফের ওপর ভারী বুটের শধ কানে এল। আমরা এদিক-ওদিক তাকালাম। ধবধবে সাদা পটভূমির যে পথ দিয়ে আমরা হেঁটে এসে এখানে বসেছি, সেই পথের শেষ মাথায় দুটো কালো মনুষ্যমূর্তি, ঘন তুষারপাতের মধ্যে তাদের দেখা যায় কি যায় না। তবে বোঝা যাচ্ছে, একজন বেশ লম্বা-চওড়া, অন্যজন তার চেয়ে খাটো এবং সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়া। দুজনের হাতেই ওয়াকিং স্টিক। তারা হেঁটে আসছে আমাদের দিকে। খাটোজন সামনে ঝুঁকে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, বোঝা যাচ্ছে লোকটা বয়স্ক।

আমরা একদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইলাম। তারা আমাদের থেকে হাত দশেক দূরে থাকতেই কাকা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'আরে, এটা তো

ভ্লাদিমির ইলিচ!'

আমিও দেখলাম হ্যাঁ, লেনিনই বটে এবং তাঁর পাশের দশাসই লোকটাকেও চিনতে পারলাম। সেই ভোলান্দ চিওর্নি মাগ, দিয়াভোল, অশুভর অবতার।

আমরা তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলাম, লেনিনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন, তাঁর পাশে অশুভ ভোলান্দ। মুখোমুখি থামার পর কাকা লেনিনকে রুশিতে সম্ভাষণ জানালেন, আমিও তার পুনরাবৃত্তি করলাম। ভ্লাদিমির ইলিচ হেসে আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। কাকা ভোলান্দের দিকে একবারও তাকালেন না। ভোলান্দ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, আমি তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় তার মুখের দিকে ভালো করে তাকালাম এখন তাকে অনেকটা স্তালিনের মতো দেখাচ্ছে।

'ভ্লাদিমির ইলিচ, আমার কিছু জিজ্ঞাসা ছিল।' কাকা লেনিনকে বললেন।

লেনিন স্মিত হাসলেন 'জানি। আপনি ভুলে গেছেন। ১৯২২ সালে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি বিপ্লব করেছেন পাঁচ বছর হয়ে গেল। সুখী, সুন্দর, ন্যায্য একটা সমাজ গড়ে তুলতে আর কত বছর লাগবে? আমি আপনাকে বলেছিলাম, রাতারাতি ক্ষমতা দখল করা যায়, কিন্তু মানুষকে বদলানো খুব কঠিন। মানুষ রাতারাতি বদলায় না। দুই-চার প্রজন্মেও খুব একটা বদলায় না।'

দ্বিজেন কাকা কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাবেন, তখনই ভোলান্দ বাম হাত তুলে বাতাসে পট করে তুড়ি মেরে বলল, 'এনাফ, মিস্টার শর্মা!' সঙ্গে সঙ্গে দুজনই গায়েব হয়ে গেল। শুধু শর্মা শধটা বাতাসে প্রতিধ্বনির মতো বেজে চলল।

'আইসিইউ ১২ নম্বর বেডের পেশেন্টের অবস্থা ভালো না। আপনারা আসেন।'

'স্যার, এত রাত্রে কোথায় যাবেন?'

'হাসপাতালে যেতে হবে, গেট খোলেন।'

ইস্কাটন থেকে হাতির ঝিলের পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। ঘড়িতে রাত আড়াইটা। স্কয়ার হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতে নিশ্চয়ই তিনটা বেজে যাবে। কিন্তু সোনারগাঁও হোটেলের মোড়ে পৌঁছতেই বেলা আড়াইটা বেজে গেল। সেখানে আমাকে থামালেন আমার বাবা।

'কই যাস? আমার সঙ্গে আয়।'

'কোথায়, বাবা?'

'শ্মশানে। তোর কাকাকে পোড়াবি না?'

আকাশ ভেঙে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

সবুজবাগের বরদেশ্বরী কালীমাতা মন্দিরের পাশে চিতা জ্বলে উঠল। বাবা আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বললেন, 'ওই মানুষটাকে তোর মনে পড়বে। প্রতিদিন মনে পড়বে, দেখিস।'

.....

('আজ দ্বিজেন শর্মার মৃত্যুদিবস। ২০১৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি অনন্তলোকে পাড়ি জমিয়েছেন।'; সাহিত্যিক ও পুস্তক নির্মাতা মশিউল আলম তাঁর ফেসবুকে এই শ্রদ্ধার্ঘ (গল্প নাকি ব্যক্তিগত গদ্য) নিবেদন করেন অনুবাদক, পরিবেশ সুরক্ষা ও সৌন্দর্যায়নের নিরলস কর্মী, সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনের একজন বর্ণাঢ্য মানুষ দ্বিজেন শর্মার মৃত্যুদিবসে।)

— বৌদি এটা ঠিক করেনি। আপনার এত ব্যস্ততা, দায়িত্ব, এর মধ্যে আবার আমার বোঝা।

—আসতে চেয়েছি, খুব, কিন্তু.....

দুম করে আলো চলে গেল। অন্ধকার ঘরে প্রায় অপরিচিত দু'জন নিঃশধে দাঁড়িয়ে। হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়, কিন্তু শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার ফরমান জারি হয়েছে বিশ্বজুড়ে।

মোমবাতি জ্বালিয়ে দুটো প্লেটে ভাত বাড়ল দিয়া। রজতের মুখটা আর মনে পড়ল না। ❐

কবিতা

## অনুপ্রবেশ !

জয়ন্ত কুমার সাহা

অনুপ্রবেশ বলছো বটে
কিন্তু সেটা ঠিক না ভুল,
দেখছো যেটা চোখের দেখা
মন দেখে তা ছিন্নমূল ...

রুটির খোঁজ, রুজির খোঁজ
একটু মাথা গোঁজার খোঁজ,
টপকে বেড়া যাচ্ছে কত
এমনি খোঁজে মানুষ রোজ ...

কুবের হ'লে দেশ বেছেনেয়
টাকাতে পায় নতুন দেশ,
হয়ত শখে, নয়পালিয়ে
ছোঁয় কেবলো তেনারকেশ ...

ইতর যদি বাস্তু ছিঁড়ে
বাঁচতে খোঁজে বেড়ার ফাঁক,
রাষ্ট্র এসে ফেলবে ছুঁড়ে
বলবে-ওরা নিপাত যাক ...

থাকবো আমি, বাঁচবো আমি
আমার মানে আমার সুখ,
রাষ্ট্রবাদী মানববাদী
দেখতে কী চাই, কেমন মুখ ...

ছোট্ট বেড়া, ছোট্ট পাঁচিল
রুখবে কাকে কেমন তর,
আইন বড়ো, রাষ্ট্র বড়ো
কিন্তু মানুষ বৃহত্তর ...

## বিপন্ন সেই মেয়ে

মৈথিলী

চাতালকে পিছনে রেখে শ্যাওলা ধরা সরু সিঁড়ির রাস্তা গিয়ে মিশল পাহাড়ের কিনারে
ঝিরঝিরে বৃষ্টি
বিপন্ন সেই মেয়ে
বৃষ্টি আর ধস
ওরা প্রশ্রয় দেয় না সমাজের নিজস্ব কড়াকড়ি
বাঁধন আলগা হলেই অপরাধের বাড়বাড়ন্ত ছড়িয়ে পড়ে সবুজ পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে
নগ্ন দেহটা ঝুলে আছে ক্লক টাওয়ার থেকে
দৃশ্যতই সামাজিক বিপর্যয়
স্নায়ুযুদ্ধে দুর্বল আতশবাজি
নিষ্পত্তির চৌকাঠে আটকে যাচ্ছে
গার্হস্থ্য হিংসা আর কতশত চ্যালেঞ্জ...

## প্রকাশিত হব

মিলি দাস

পৃথিবীর সমস্ত শ্রাবণ মেঘ এসে মিশেছে ভারতবর্ষের মানচিত্রে,
নীল আগুন ছুঁয়ে বৃষ্টিতে নূপুর পায়ে কামিনী হেঁটে চলে দেবতার কাছে,
দীর্ঘ প্রতিশ্রুতির নিঃশ্বাসে শুধুই উদ্বাস্তু দাবদাহ,
চেরাপুঞ্জির জীর্ণ উপত্যকায় ভেজা ঘাস খুঁজে চলে নতুন সড়ক,
দেশজোড়া প্রতিটি বারান্দায় অসহায় মুখ ভিড় করে আসছে।
তবুও সাম্রাজ্য গড়ার নেশায় আজীবন আমি আলতা পায়ে তুলসী তলায় সূর্যের কাছাকাছি থেকে যাব,
নিভে যাওয়া প্রদীপের সলতে জ্বালিয়ে ধূপ চন্দন নিয়ে মাটির কাছে অঞ্জলি দিয়ে যাব।
স্বপ্নের ভেতর দেখবো এভাবে আর কতক্ষন জেগে থাকা যায় !

# ভরা থাক স্মৃতিসুধায়

আসা - ২৬.০১.১৯৬৬

যাওয়া - ০৫.০৯.২০২৪

শুভ্রা গুপ্ত

তোমায় আমি ভালোবাসা দিয়ে ভরাবো চিরদিন,
যদি দাও মোরে একটুকু ঠাঁই তোমাতেই হবো লীন।
বিদায় দিয়েছি যত সাধ ছিল মোহ-কামনা-বাসনা;
এখন সঁপেছি আপনারে শুধু পাবার আশায় করুণা।
অনেক যাতনা বহেছি জীবনে আর নাহি পারি বহিতে
দু-হাত মেলে ডাকিবেই জানি তাই হবে বসে রহিতে।